সীমান্ত গান্ধী
ও
খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার
আন্দোলন

সীমান্ত গান্ধী

[খান্ আবদুল গফর খান্]
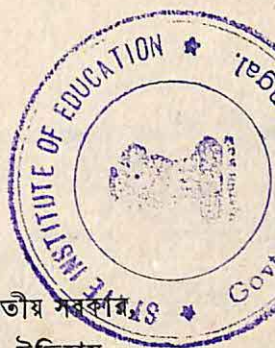
আগস্ট-সংগ্রাম ও মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার,
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস,
আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ দিবসে কলিকাতায়
গুলিবর্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীসুকুমার রায়
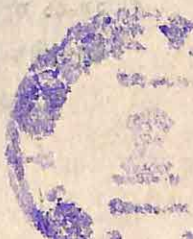
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২ : নঈ দিল্লী ১

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

গফর খানের জীবনী এখন পর্যন্ত রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি লিখিবার সময় আমাকে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে। কিন্তু জীবনীর যোগসূত্র রক্ষা করিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া পুরাতন ও নূতন সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিতে হইয়াছে। পুস্তকখানি লিখিবার সময় বন্ধু শ্রীযুত সত্যেন সেনের নিকট হইতে আমি যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছি। লেখার ব্যাপারে তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য না করিলে হয়ত বইখানি অর্ধেক লেখা হইয়াই পড়িয়া থাকিত।

সীমান্ত গান্ধী ও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। ১৯৩০ এবং ১৯৪২ সালের আন্দোলনে পাঠানজাতি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে—শান্তিপূর্ণ-ভাবে স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মবলি দিয়া যে অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহাই সীমান্ত আন্দোলন সম্পর্কে জানিবার জন্য দেশবাসীর আগ্রহ জাগাইয়া তুলিয়াছে। তবে গফর খানের আন্দোলনকে বুঝিতে হইলে আগে মানুষটিকে চিনিতে হইবে। তাই সর্বপ্রথম সেই চেষ্টাই করিয়াছি। ইতি—

মহালয়া
১৩৫৩

গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

সীমান্ত গান্ধীর বয়স এখন ৮০ বৎসর। জ্ঞানের জ্যোতিতে উজ্জ্বল তাঁহার মুখমণ্ডল। গাম্ভীর্য ও প্রশান্তভাবমণ্ডিত তাঁহার চরিত্র। মুখে সর্বদা হাসি লাগিয়াই আছে। ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই দীর্ঘতম ব্যক্তি। খাঁটি হিন্দুস্থানীতে তিনি কথা বলেন। অবশ্য কথা বলেন অতি অল্পই। তিনি বাণী অথবা বক্তৃতা দেওয়া পছন্দ করেন না। সীমান্ত গান্ধী কর্মে বিশ্বাসী এবং দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করিতেই তিনি ভালবাসেন। তিনি বলেন, "আমি খোদার সেবকমাত্র। আমি খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। এই দেশের যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গ্রামের মানুষ আছে, তাহাদের মধ্যে গিয়া কাজ করাতেই আমি বিশ্বাস করি।"

২২ বৎসর বয়সে খান্ আবদুল গফর খান্ সক্রিয়ভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তিনি ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীনভাবে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন। সুদীর্ঘ কারা-লাঞ্ছনা ও নির্যাতনে নিপীড়িত, আত্মত্যাগে সুমহান্, স্বাধীনতা-সাধনার এই বীর পুরোহিতকে সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ ও প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত এক মুহূর্তের জন্যও নিরুদ্যম বা নির্বীর্য করিতে পারে নাই। তাঁহার 'সেবার মহৎ ব্রত' ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

গফর খান্ কখনও ধর্মকে কর্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। ধর্মে একান্ত বিশ্বাস হইতেই তিনি কর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। খোদার সেবা অর্থাৎ মানবসেবাই তাঁহার ধর্ম। অহিংসা ও মানবসেবাকে তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের তিনি অহিংসা ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। সত্যের প্রতি

তাঁহার নিষ্ঠা, অহিংসার প্রতি তাঁহার আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁহার অহিংসার আদর্শের জন্য তাঁহাকে কাহারও নিকট ঋণী মনে করিলে মস্ত ভুল করা হইবে। উইলিয়াম বার্টন তাঁহার 'নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার' গ্রন্থে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—"Ghaffar Khan is in complete accord with the principle of non-violence, but has not borrowed his outlook from Mahatma Gandhi. He has reached it and reached it independently."

"অহিংসার আদর্শের সহিত গফর খানের সম্পূর্ণ মিল আছে। কিন্তু তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গী মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে ধার-করা নয়। তিনি তাঁহার নিজের চেষ্টাতেই ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন।" "ইয়ং ইণ্ডিয়া"য় গফর খান্ ইহার উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"My non-violence has almost become a matter of faith with me. I believed in Mahatma Gandhi's Ahimsa before. But the unparalleled success of the experiment in my province has made me a confirmed champion of non-violence. God willing, I hope never to see my province take to violence. We know only too well the bitter results of violence from the blood-feuds which spoil our fair name. We have an abundance of violence in our nature. It is good in our own interests to take a training in non-violence. Moreover, is not the Pathan amenable only to love and reason ? He will go with you to hell if you can win his heart, but you cannot force him even to go to heaven."

"আমার অহিংসা আমার নিকট প্রায় ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। আমি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসায় পূর্বেই বিশ্বাস করিতাম। আমার প্রদেশে ইহার অতুলনীয় সাফল্য অহিংসার উপর আমার বিশ্বাসের ভিত্তি আরও দৃঢ় করিয়াছে। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন, আমি আশা করি যে, আমার প্রদেশকে আর হিংসা গ্রহণ করিতে দেখিব না। রক্তপিপাসু ঝগড়া-বিবাদ—যাহা আমাদের সুনাম কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহা হইতেই হিংসার পরিণতি যে কি ভীষণ তাহা আমরা ভালরূপেই বুঝিয়াছি। আমাদের প্রকৃতিতে প্রভূত পরিমাণে হিংসার ভাব রহিয়াছে। আমাদের স্বার্থের খাতিরেই আমাদের অহিংসার অনুশীলন করা উচিত। তাহা ছাড়া পাঠানরা কি একমাত্র প্রেম ও যুক্তিরই অধীন নহে? তুমি যদি তাহার চিত্ত জয় করিতে পার, সে তোমার সহিত নরকে যাইতেও প্রস্তুত আছে, কিন্তু জোরজবরদস্তি করিয়া তুমি তাহাকে স্বর্গেও লইয়া যাইতে পারিবে না।"

প্রেমের দ্বারাই গফর খান্ পাঠানদের হৃদয় জয় করিয়াছেন। একটি দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপরায়ণ জাতি অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিল—একথা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। গফর খানের আজীবন ত্যাগস্বীকার ও কঠোর তপস্যাই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের উক্তিই খাঁটি ধারণা জন্মাইতে পারে। মহম্মদ ইউনুস্-এর গ্রন্থের প্রস্তাবনা লিখিতে গিয়া গফর খান্ সম্বন্ধে তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"When the history of the present day comes to be written, only very few of those who occupy public attention now, will perhaps find mention in it. But among those very few there will be the outstanding commanding figure of Badshah Khan. Straight and simple, faithful and

true, with a finely chiselled face that compells attention, and a character, built up in the fire of long suffering and painful ordeal, full of the hardness of the man of faith believing in his mission, and yet soft with the gentleness of one who loves his kind exceedingly."

"বর্তমান কালের ইতিহাস যখন রচিত হইবে তখন জনপ্রিয় নেতাদের অতি অল্পসংখ্যক মাত্র সেই ইতিহাসে স্থান পাইবেন; কিন্তু সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে বাদশা খানের অনন্যসাধারণ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্ব স্থানলাভ করিবে। তিনি সোজা ও সরল, বিশ্বাসী ও সত্যনিষ্ঠ এবং সুন্দরভাবে খোদাই-করা তাঁহার মুখমণ্ডল স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুদীর্ঘ নির্যাতন ও শোকাবহ কঠোর পরীক্ষায় তাঁহার চরিত্র অগ্নিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসে তিনি কঠোর, কিন্তু মানুষকে যাঁহারা একান্তভাবে ভালবাসেন, তাঁহার চরিত্র তাঁহাদের ন্যায়ই নম্র ও বিনয়ী। যখন তিনি স্বদেশবাসিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন তখন দেখা যায়, কিরূপ স্নেহ ও প্রশংসার ভাব লইয়া তাহারা গফর খানের প্রতি চাহিয়া আছে।" তিনি পুশ্‌তো ভাষায় তাহাদের সহিত কথা বলেন। তাহাদের দোষত্রুটির জন্য যদিও তিনি বারবার তাহাদের ভর্ৎসনা করেন তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরে সর্বদাই নম্রতা, বিনয় এবং কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহামতি সি. এফ. এণ্ডরুজ গফর খানের অন্তরের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। একদিক দিয়া উভয়ের মধ্যে একটা খাঁটি মিল ছিল। উভয়েই দীনবন্ধু। মহামতি এণ্ডরুজ তাঁহার 'নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার' গ্রন্থের নানা স্থানে বাদশা খানের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানিও গফর খান্ ও তাঁহার আন্দোলন সম্পর্কে ইংরেজদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। তিনি গফর খান্ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন খাঁটি বিশ্বাস লইয়াই বলিয়াছেন। বেশ জোরের সহিত তিনি একথা বলিয়াছেন,—"Khan Abdul Gaffar Khan I can speak with real confidence. He is transparently sincere, with the simple directness of a child, and he is above all a firm believer in God. He won my heart both by his gentleness and truth. His fearlessness, also, made me feel his moral greatness."

"খান্ আবদুল গফর খান্ সম্বন্ধে আমি খাঁটি বিশ্বাস লইয়া বলিতে পারি। তাঁহার আন্তরিকতার মধ্যে কোন আবিলতা নাই। তিনি শিশুর ন্যায় সরল এবং সর্বোপরি তিনি ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী। সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ও নম্র ব্যবহার দ্বারা তিনি আমার হৃদয় জয় করিয়াছেন। তাঁহার নির্ভীকতার মধ্যে আমি তাঁহার নৈতিক মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছি।"

গফর খানের আসন ঠিক কোথায় একমাত্র ইতিহাসই তাহার প্রমাণ দিতে পারে; কিন্তু তবুও একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানুষ হিসাবে তাঁহার মহত্ত্ব কোন দিন মলিন হইবে না। যতই দিন যাইতে থাকিবে, তাঁহার মহত্ত্ব ততই ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। ইতি—

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

বিষয় | পৃষ্ঠা

একই উদ্দেশ্য-সাধনে উদ্বোধিত হইয়া স্বদেশের সেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের জীবনও দেশের জন্য অকুণ্ঠ ত্যাগস্বীকার, নিষ্পেষণভোগ ও কারাবরণের জীবন। পাঠানদের মধ্যে জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনের মূলে এই খান্-পরিবারের দান ঠিক কতখানি, ইতিহাস তাহা নির্ণয় করিবে। তবে একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খান্-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টার ফলেই আজ পাঠানজাতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যের সহিত সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে।

আবদুল গফর খান্ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন পৃথিবীর বুকে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় যেমন একদিকে ধনতন্ত্রবাদ চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে ব্রিটেন ক্রমে গণতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে কিন্তু সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও তজ্জনিত বৈরিভাব পুরোপুরিই বজায় ছিল।

এদিকে ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে সেই সময় হইতে সীমানানির্দেশের কার্য শুরু হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধ ও ভারতের উপর তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা ভুলিতে পারে নাই। কাজেই তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এই সীমা-নির্দেশের ব্যাপারে আর একটি যুদ্ধের আশঙ্কা দেখিতে পাইলেন। সৈন্যব্যয় সম্পর্কে দীন্শা এডুলচী হিসাব করিয়া দেখান যে, ১৮৬৪ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সৈন্যব্যয় মাত্র ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়; আর ১৮৮৫-৮৬—১৮৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আর এই অর্থ ব্যয় করা হয় শুধু রুশিয়ার আক্রমণ-প্রতিরোধ করিবার জন্য। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সামরিক দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

স্থান। সুতরাং সীমান্ত রক্ষার অজুহাতে ভারতীয়দের ব্যয়ে বিরাট বিদেশী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা হয়। তাই সেই সময় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে বালগঙ্গাধর তিলক এই মর্মে এক প্রস্তাব করেন যে, ভাবী আক্রমণের আশঙ্কায় জলের মত অর্থব্যয় না করিয়া, ভারতবাসীরা যাহাতে সত্য সত্যই আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে সেজন্য অস্ত্র-আইনের কঠোরতা দূর করিয়া সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় হইতে স্বেচ্ছাসৈন্য লইয়া রক্ষীবাহিনী গঠন করা হউক। কিন্তু নেতৃবৃন্দের সে আবেদন ব্যর্থ হয়। ভারতের অভ্যন্তরে গণজাগরণের সূচনা এবং ভারতের বাহিরে যখন ইউরোপে সাম্রাজ্য লইয়া বিরোধী স্বার্থের হানাহানি চলিতেছে, সেই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক নিভৃত পল্লীতে এই ঋষিকল্প মানবের জন্ম হয়।

বাল্য ও শিক্ষা

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি বাল্যকাল হইতেই গফর খানের বিশেষ আগ্রহ ছিল। অতি অল্প বয়সেই তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি 'চার্চ অব ইংলণ্ড মিশন' স্কুলে ভর্তি হন। তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খান্ সাহেবও পেশোয়ারে এই মিশন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে গফর খান্ পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের প্রভূত সুযোগ পান। এই স্থানে তিনি উইগ্রাম নামে একজন ধার্মিক মিশনারীর সংস্পর্শে আসেন। মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ই. এফ্. ই. উইগ্রাম উদারনৈতিক মতবাদ ও স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক ছিলেন। উইগ্রামের শিক্ষা গফর খান্‌কে এই দুইটি গুণেরই অধিকারী করিয়াছে। গফর খান্ ভবিষ্যৎ জীবনে বহুবার এই শিক্ষাগুরুর নিকট তাঁহার ঋণের কথা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করিয়াছেন। ইংরাজ

চরিত্রের বিবিধ গুণাবলীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃই তিনি ভবিষ্যতে একে একে তাঁহার পুত্রদের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।

উচ্চশিক্ষাভিলাষে আবদুল গফর খান্ যেদিন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, সেদিনটি উটামানজাই পরিবারের পক্ষে একটি বড় শুভদিন। সে সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। বর্তমানের ন্যায় সে সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষার দ্বন্দ্বভূমি ছিল না। দেশপ্রেম ও জাতীয়তার আদর্শই সেখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তরুণ গফর খান্ সর্বপ্রথম মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সংস্পর্শে আসেন। মৌলানা আজাদ তখনই উর্দু ভাষায় একজন শক্তিশালী লেখকরূপে সমগ্র ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'আল-হেলাল' সে সময় সে যুগের মনীষী এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান যুবকগণের মনকে নাড়া দিয়াছিল। "প্রথমতঃ, আলিগড় দলের গতানুগতিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ; দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানদের অন্তর হইতে বৈদেশিক শাসনের প্রতি আনুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের" উদ্দেশ্য লইয়াই মৌলানা আজাদ 'আল-হেলাল' প্রকাশে উদ্যোগী হন। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিমদের নেতৃবৃন্দ আল-হেলালের তরুণ লেখকের প্রতি নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে থাকে। মৌলানা আজাদ কাহারও বিরুদ্ধাচরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এবং বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে ভীত না হইয়া স্বাধীনভাবে একাকী মুক্তির পতাকা হস্তে 'আল-হেলাল' প্রচার করেন। স্বাধীন চিন্তা, নির্ভীক মনোভাব, সংস্কার ও বিপ্লব—ইহাই হইল তাঁহার পাথেয়। গফর খান্ তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার পর উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। মৌলানা আজাদের জাতীয়তা, তাঁহার স্বাধীন চিন্তাধারা ও প্রগতিমূলক রচনাবলী গফর খানের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গফর খান্ প্রবল আত্মবিশ্বাস

ও একটা উদার আদর্শবাদ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত মস্তক ও তেজোদীপ্তিময় ব্যক্তিত্বের একটা অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহা মন্ত্রের ন্যায় চেতনাকে মুগ্ধ করে। সে সময় তিনি দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি ও ওজনে ২ মণ ১৫ সের ছিলেন।

কর্তব্য-নির্ধারণ

গফর খানের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই সৈনিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে গফর খানের অবচেতন মনে এই গৌরবলাভের একটা প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান ছিল। তিনিও সেনা-বিভাগে যোগদান করিবেন স্থির করেন। যোদ্ধা-জীবন বরণ করা যে-কোন একজন পাঠানের পক্ষেই অতি স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি যে সেনাবিভাগে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। অতঃপর গফর খান্ সেনা-বিভাগে কমিশনের জন্য দরখাস্ত করেন। সেনাবিভাগে যোগদান করিবেন স্থির করিবার পর একদিন গফর খান্ তাঁহার এক সৈনিক বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের জন্য পেশোয়ারে এক সামরিক দপ্তরে গমন করেন। সেখানে গিয়া গফুর খান যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে বিদেশীর কর্তৃত্বাধীন সৈনিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তিনি একজন প্রবীণ ভারতীয় সৈন্যকে জনৈক তরুণ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী কর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে দেখিলেন। এখানেও সেই সাদায়-কালায় বিভেদ। সেনা-বিভাগে মনুষ্যত্বের অবমাননার এই চিত্র দেখিয়া এক নিমেষে তাঁহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অতঃপর ভারাক্রান্ত মন লইয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ইহার পরিণতি অতি সুদূর-প্রসারী হইল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি

গফর খানের জীবনে একটি বৃহৎ পরিবর্তনের সূচনা আনিয়া দিল। অতঃপর গফর খান্ সেনা-বিভাগে যোগদানের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া শান্তির সৈনিকরূপে মুক্তির সাধনাকে জীবনে ও কর্মে একান্তভাবে গ্রহণ করিলেন। ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে গফর খান্ প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তিনি ভারতের প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় একেবারে অনাড়ম্বর জীবনযাপনে ব্রতী হইলেন।

দুইবার তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। দুইবারই তিনি সেই পদ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। গফর খান্ বলেন যে, এতবড় গৌরবময় পদের দায়িত্ব বহন করিবার মত যোগ্যতা তাঁহার নাই। তিনি একজন খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। মানবসেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন সামান্য সৈনিকরূপেই জীবন-যাপন করিতে চাহেন।

জনসেবায় আত্মনিয়োগ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে খান্ আবদুল গফর খান্ প্রথম স্বদেশের জনসাধারণের মধ্যে গিয়া কাজ আরম্ভ করেন। অশিক্ষার হেয়তা ও সমাজব্যবস্থার গলদ দূর করিয়া পাঠানদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য গফর খান্ তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়া তিনি 'অঞ্জুমান-ই-ইল্লা-ই-আফাগিনা' নাম দিয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী তখন পর্যন্ত তাঁহার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এই প্রচেষ্টায় তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন হাজি আবদুল ওয়াহেদ সাহেব। হাজি সাহেব হাজি তুরাংজাই নামেই জনসমাজে অধিক সুপরিচিত ছিলেন। পেশোয়ার জেলার গদ্দর নামক স্থানে তাঁহাদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। তাঁহাদের অক্লান্ত

পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে শীঘ্রই পেশোয়ার ও মর্দান জেলায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় (আজাদ স্কুল) স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহাদের আন্তরিকতায় পাঠানরা বিপুল উদ্দীপনার সহিত সাড়া দেয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে গফর খান্ হাজি সাহেবের সঙ্গ হারাইলেন। হাজি সাহেব তরুণ গফরের প্রধান সহায় ছিলেন এবং গফর খান্ও সকল ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিতেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই তাঁহাদের গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখিতেছিলেন। কিভাবে গফর খান্কে হাজি সাহেবের সঙ্গচ্যুত করা যায় সীমান্ত কর্তৃপক্ষ সেই সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। বিচক্ষণ হাজি সাহেব সরকারী কর্তৃপক্ষের অসদুদ্দেশ্য টের পাইয়া উপজাতীয় অঞ্চলে সরিয়া পড়েন। ইহার পর গভর্নমেণ্ট এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করেন। হাজি সাহেবের অনুপস্থিতিতে গফর খানের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনিও উপজাতীয় অঞ্চলে গিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবেন স্থির করিলেন। তরুণ গফর খান্ ইতিমধ্যেই সুবিখ্যাত বিপ্লবী নেতা মৌলানা ওবেদুল্লা সিন্ধী ও দেওবান্দের সেখ-উল-হিন্দ মৌলবী মামুদুল হাসানের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ওবেদুল্লা সিন্ধী ও মৌলবী হাসান উভয়েই চরমপন্থী এবং ভারতের মূল সমস্যা সমাধানের পথ সম্পর্কে উগ্রমতাবলম্বী ছিলেন। গফর খান্ দেশের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন। বয়সে তরুণ হইলেও গফর খানের বিচক্ষণতায় তাঁহারা বিস্মিত হন। তাঁহাদের প্রগতিমূলক চিন্তাধারা গফর খান্কে অনুপ্রাণিত করে। অতঃপর গফর খান্ বহুদিন ধরিয়া মমন্দ ও বাজাউর উপজাতীয় অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু কোন স্থানেই মন স্থির করিতে না

পারিয়া উপজাতীয় অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। পেশোয়ারে ফিরিবার পর তিনি পুনরায় লুপ্তপ্রায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহের পুনঃসংগঠন ও সম্প্রসারণে দৃঢ়সংকল্প হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

সংকল্পনিষ্ঠা

গফর খানের সংস্কারমূলক কর্মপন্থায় সীমান্ত গভর্নমেণ্ট শঙ্কিত হইয়া উঠেন। সীমান্ত গভর্নমেণ্ট গফর খান্‌কে সাবধান করিয়া দিবার জন্য তাঁহার পিতা বৈরাম খান্‌কে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। গফর খান্ দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের সংকল্প লইয়াই কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কোন বাধাই তাঁহাকে কোনদিন সে-সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। কর্মের যে উদ্দাম প্রবাহ তাঁহার অন্তরে অন্তঃসলিলা বেগবান নির্ঝরের মত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে রোধ করিবার জন্য বিদেশী শাসকদের সকল ষড়যন্ত্রই সে সময় ব্যর্থ হইয়াছিল।

সীমান্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশের কথা গফর খান্‌কে জানান হইলে তিনি পিতার নিকট একটিমাত্রই প্রশ্ন উত্থাপন করেন, "আচ্ছা, তাঁহারা যদি আমার দৈনন্দিন প্রার্থনা বন্ধ করিবার জন্য আপনাকে নির্দেশ দিতে বলেন, আপনি কি আমাকে তাহাই করিতে বলিবেন?" পুত্রের কণ্ঠে সংকল্পের আভাস পাইয়া পিতাও সমুচিত উত্তর দেন, "কখনই না।" গফর খান্ তখন বলেন যে, দরিদ্রের সেবাই তাঁহার দৈনন্দিন প্রার্থনার বৃহত্তম অংশ। পুত্রের নিষ্ঠা পিতার হৃদয় জয় করে। বৈরাম খান্ পুত্রকে সংকল্পচ্যুত করিবার ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতা সীমান্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন। পরিশেষে গভর্নমেণ্ট এই তথাকথিত অবাধ্যতার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য গফর

খান্, তাঁহার ৯০ বৎসরের পিতা বৈরাম খান্ ও তাঁহাদের পরিবারের অন্যান্য সকলকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনা ঘটে ১৯১৯ সালে।

সীমান্তে এক পুত্রের তথাকথিত বে-আইনী কার্যকলাপের জন্য বৃদ্ধ পিতাকে সপরিবারে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করা হইল। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একথা ভাবিয়া দেখিলেন না যে, বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ খান্‌সাহেব কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য রণক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষ লইয়া তাঁহাদেরই পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। ডাঃ খান্‌সাহেবকে তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে গ্রেপ্তারের কথা ভারত সরকার ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না। বহুকাল ইউরোপের নানাস্থানে অতিবাহিত করিয়া ১৯২০ সালে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ডাঃ খান্‌সাহেব সুদীর্ঘ ১১ বৎসর ভারতের বাহিরে ছিলেন। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের বহু পরিবর্তন হইয়াছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের জনগণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বিক্ষোভের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছে। ডাঃ খান্‌সাহেব ভারতে ফিরিবার পর সমস্তই দেখিলেন, সমস্তই শুনিলেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি তাঁহার সকল শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গেল। ব্রিটিশ-শাসনের অনাচারে তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

বাদশা খান্

১৯১৯ সালেই 'সম্রাটের ঘোষণা'র পর গফর খান্, তাঁহার পিতা ও গফর খানের পরিবারস্থ অন্যান্য সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুক্তিলাভ করিয়াই গফর খান্ আবার শিক্ষায়তনগুলির পুনর্গঠনে উদ্যোগী হন। ১৯১৯ সালের শেষদিকে গফর খানের জন্মভূমি

উটামানজাই-এ এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় সীমান্ত প্রদেশের প্রধান প্রধান কর্মিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই সভায় গফর খানের প্রতি পাঠান জনসাধারণের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারা গফর খান্‌কে 'বাদশা খান্' (খান্‌দের রাজা) উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেন। সমস্ত সীমান্ত প্রদেশে, এমন কি সীমান্ত প্রদেশের বাহিরে ভারতের সর্বত্র তিনি আজ এই নামে সুপরিচিত হইয়াছেন।

খিলাফত আন্দোলন

১৯২০ সালের ঘটনাবলী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। এই সময় তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তিবর্গের, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশের, কঠোর মনোভাব প্রকটিত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মুসলমানসমাজে এজন্য ভীষণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। তুরস্কের সুলতান মুসলমান জগতের খলিফা ও পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের রক্ষক। তাঁহার রাজ্যচ্যুতি ঘটিলে বা তুর্কী-সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইলে মুসলমান সমাজের ধর্মহানির বিশেষ আশঙ্কা। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের নিকট ও বিলাতে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড্ জর্জের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় না। ইহার প্রতিবাদের জন্য মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দেন ও তাঁহাদের নিকট অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব করেন।

বস্তুতঃ যখন সেভার্স্ সন্ধির শর্ত (১৪ই মে, ১৯২০), প্রকাশিত হইল, তখন মিত্রশক্তি তথা ব্রিটেনের মনোভাব বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। কনস্টান্টিনোপলে তুর্কী-সুলতান মিত্রশক্তিবর্গের নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। তুরস্কের ইউরোপস্থিত

অংশ একটি কমিশনের শাসনাধীন হইল, তুর্কী-সাম্রাজ্যের আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি অংশকে ব্রিটিশ ও ফরাসীরা ম্যাণ্ডেটের আবরণে নিজ নিজ সুবিধামত আয়ত্ত করিয়া লইল। মিশর ও আফগানিস্থানেও ব্রিটিশ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। মুসলমান রাজ্যসমূহের উপর এই অবিচারে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ-বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। ২৮ মে তারিখে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত খিলাফত-সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহার পর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এই আন্দোলনের নামই 'খিলাফত আন্দোলন'। বহু ভারতীয় মুসলমান তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহের প্রতি ব্রিটেনের ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে স্বদেশ ত্যাগ করিতে মনঃস্থ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক পেশোয়ার ও সীমান্তের অন্যান্য স্থানে আসিয়া সমবেত হয় এবং আফগানিস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। 'বাদশা-খান্' ও তাঁহার সহকর্মীরাও এই 'হিজরাত আন্দোলনে' যোগদান করেন। কাবুলে উপস্থিত হইয়া গফর খান্ তথায় বিজয়ী রাজা আমানুল্লা খানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। গফর খান্ আমানুল্লা খান্ ও তাঁহার পরিচরবর্গের সহিত সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা লইয়াও তাঁহাদের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনায় গফর খান্ বুঝিতে পারেন যে, এইভাবে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া আশ্রয় গ্রহণে কোন ফল হইবে না। ইহা স্থির করিবার পর তিনি সীমান্ত-প্রদেশে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় মমন্দদের বসতি-অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্যের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে গফর খান্ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর তিনি স্থির করেন যে, যে-সমস্ত স্থানে তিনি প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে না পারিবেন সে-সকল

স্থানে তিনি আর কাজ করিবেন না। সেই সময় হইতে গফর খান্ গুপ্ত-আন্দোলন পরিচালন বা গুপ্ত-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলেন। তাঁহার পরবর্তী জীবনে তাঁহার সমস্ত আন্দোলনই প্রকাশ্য-আন্দোলন। গুপ্ত-আন্দোলনের নিষ্ফলতার কথা চিন্তা করিয়া গফর খান্ পুনঃপুনঃ একথা বলিয়াছেন,—"ব্রিটিশ জানে যে. এখানে তাহাদের উপস্থিতি আমরা চাই না। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হওয়া উচিত। আমাদের যাহা করণীয় তাহা প্রকাশ্যভাবেই করা উচিত। যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কোন বৃহৎ কাজ করা যায় না। অবশ্য একথাও আমি ভালরূপে জানি যে, যেটুকু কাজ আমরা করি, তাহা আমাদের অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। কারণ গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় সর্বদাই আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। তাই আমাদের যে সংগ্রাম তাহাতে ভীরুর স্থান নাই।" (Frontier Speaks)

কোন্ শক্তি বড় ?

গফর খান্ পাঠানদের সামাজিক জীবনে নানাপ্রকার গলদ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতে থাকেন। পাঠানদের ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন এবং শান্তিপ্রিয় জাতিতে পরিণত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি, গফর খান্ তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেন। গৃহবিবাদে অযথা শক্তিক্ষয় না করিয়া তাহারা যাহাতে নিজেদের কল্যাণ-চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে, পাঠানদের তদনুরূপ শিক্ষা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই ছিল গফর খানের সমগ্র প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। বিচ্ছিন্ন ও দুর্ধর্ষ পাঠানদের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত

করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আজীবন ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বহুকাল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে সামরিক শক্তির প্রয়োগে যাহা সম্ভব করিতে পারেন নাই, কোন্ শক্তিবলে গফর খান্ তাহা সিদ্ধ করিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও এই তথাকথিত সভ্যতার যুগে এইরূপ একটি যুদ্ধপরায়ণ দুর্ধর্ষ জাতির সন্ধান মিলে না। এইরূপ একটি দুর্ধর্ষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতি যে শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে সেই শক্তি যে সামরিক শক্তি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী এ সত্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই শক্তি যে সামরিক শক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং শত্রু বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অধিকতর ফলপ্রসূ, পাঠানদের দৃষ্টান্তে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই শক্তি সামরিক শক্তির ন্যায় মানবহৃদয়কে বিক্ষুব্ধ বা উন্মত্ত করে না, সংযত ও মুগ্ধ করে। এই শক্তি আজ প্রত্যূষকালীন সূর্যের ন্যায় পূর্বাকাশে উদিত হইয়া কিরণরশ্মিজালে ভারতের জনমন উদ্ভাসিত, তরঙ্গায়িত ও মথিত করিয়াছে। সামরিক শক্তি বা প্রতিক্রিয়াশীল পশুশক্তি একদিন এই শক্তির তুলনায় সূর্যের পার্শ্বে নক্ষত্রের ন্যায় মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। এই শক্তির নিকট সমগ্র জগৎকে একদিন নতি স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ এই শক্তির পশ্চাতে যে আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণ, কারানিষ্পেষণভোগ ও অনশন, দুঃসহ নিপীড়ন ও নির্যাতন, অসহ্য অপমান ও লাঞ্ছনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, সেই পুঞ্জীভূত গ্লানিকে কখনই কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া একদিন মানব-চেতনার মূলে সবলে আঘাত হানিবেই।

অঞ্জুমান-ই-ইল্লা-ই-আফাগিনার পুনঃসংগঠন

গফর খান্ আফগানিস্থান হইতে ফিরিবার পর পুনরায় কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের সহযোগিতায় সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহার 'অঞ্জুমান-ই-ইল্লা-ই-আফাগিনা'র পুনঃসংগঠনে মন দেন। এই প্রতিষ্ঠানটি অচিরে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয়। অঞ্জুমান-ই-ইল্লা-ই-আফাগিনার প্রতিষ্ঠালাভের সাথে সাথে তাঁহার কর্মক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। শুধু কৃষির দ্বারা জীবিকানির্বাহ ছাড়াও পাঠানেরা যাহাতে জীবনধারণের উপযোগী অন্যান্য উপায়সমূহ আয়ত্ত করিতে পারে, সেদিক দিয়াও তিনি তাহাদের উৎসাহিত করেন। গফর খান্ নিজেই উটামানজাইয়ে একটি দোকান খুলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর সম্মুখে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শান্তিপূর্ণভাবে জীবিকা অর্জন করিয়া পাঠানেরা যাহাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া কিছুটা স্বাধীন হইতে পারে গফর খান্ সেই চেষ্টা করেন। অর্থনৈতিক কারণই সীমান্তে অশান্তির প্রধান কারণ। সুতরাং কেবল কৃষির উপর নির্ভর না করিয়া জীবিকা অর্জনের অন্যান্য উপায়গুলির প্রতিও গফর খান্ তাহাদের আকৃষ্ট করেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া পাঠানরা যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, সেইভাবে তাহাদের সংগঠিত করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার সমগ্র প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। যে-কোন সভ্যজাতি খান্ আবতুল গফর খানের এই প্রচেষ্টায় বাধাস্বরূপ না হইয়া প্রেরণাই জোগাইবে—একটি সভ্য জাতির পক্ষে অপর একটি সভ্য ও উন্নত জাতির নিকট হইতে সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া গফর খান্ সরকারী কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। সীমান্ত-প্রদেশের তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার স্যার

জন ম্যাফি গফর খান্‌কে তাঁহার সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ ভঙ্গ করিলে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানেরও হুমকি দেখাইলেন। এই আদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গফর খান্ আপন কর্তব্য করিয়া চলিলেন। পরিশেষে গভর্নমেণ্টের নির্দেশভঙ্গের অজুহাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতা

বিগত ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীদের বিবিধ উপায়ে দুর্বল করিয়া রাখিবার চেষ্টাও পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে বন্দীদের উপর জুলুম কিছুটা কমিয়াছে। কিন্তু তখনকার দিনে কারাগারে রাজবন্দীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। রাজবন্দীদের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করা হইত। গফর খান্ একজন রাজবন্দী ; সুতরাং তাঁহার প্রতি শত্রুর ন্যায়ই নির্দয় ব্যবহার করা হইত। এইবার গফর খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল গনি খান্ মিয়ানওয়ালি জেলে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেখানে পিতাকে তিনি যে অবস্থায় দেখিতে পান তাহাতে দুঃখে ও ক্ষোভে তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসে। গফর খানের পরিধানে হাফ্-শার্ট, খাটো পায়জামা, পায়ে কাঠের পাদুকা, হাতে ও পায়ে বেড়ী এবং গলায় একটি ভারী লোহার হাঁসুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুশ্‌তো ভাষায় লিখিত 'পুকতুন' নামে গফর খান্ যে পত্রিকা পরিচালনা করেন, তাহাতে তাঁহার বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি একদিকে যেমন শোকাবহ, তেমনি অন্যদিকে

রাজবন্দীদের প্রতি জেল-কর্তৃপক্ষের নির্দয় আচরণের সাক্ষ্য প্রদান করে। 'বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও কারাজীবনের অভিজ্ঞতা' এই শিরোনামায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইত। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি ভারতের বিভিন্ন কারাগারের বন্দীদের অবস্থা ও তাঁহার সুদীর্ঘ কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বন্দীজীবনে গফর খান্‌কে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহাকে দিয়া প্রত্যহ ১৫ সের হইতে ২০ সের পর্যন্ত ডাল ভাঙ্গান হইত। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করার ফলে তাঁহার কটিদেশে বাত ধরিয়া যায় এবং এখন পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নাই। একবার তাঁহার জন্য একজোড়া লোহার বেড়ী আনিলে পরাইবার সময় দেখা গেল যে, সেগুলি তাঁহার পায়ে অত্যন্ত ছোট হয়। কিন্তু জেল-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ,—সেই বেড়ী-জোড়াই তাঁহাকে পরিতে হইবে। বেড়ী পরাইবার সময় তাঁহার পায়ের গাঁইট জখম হইয়া দর্‌দর্ করিয়া রক্ত ঝরিতে থাকে। যেন কিছুই হয় নাই এই-ভাব দেখাইয়া নির্দয় জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বলেন—"ও কিছুই নয়, ক্রমেই এসব সয়ে যাবে।"—গফর খানের বিবরণ হইতে আরও জানা যায়, কিভাবে তিনি জেল-কর্তৃপক্ষের নির্দশে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতেন! গফর খান্ কাহারও নিকট কোনদিন অনুগ্রহপ্রার্থী হন নাই।

ফকির-ই-আফগান

১৯২৪ সালে গফর খান্ মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার কারামুক্তির কিছুদিন পরেই উটামানজাই গ্রামে এক বিরাট সভা আহূত হয়। সীমান্ত-প্রদেশের বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট কর্মিগণ ও হাজার হাজার পাঠান বিপুল উদ্দীপনার সহিত এই সভায় যোগদান করে। এই সভায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং গণ-সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত

করা হয়। এই সভায় সমবেত বিপুল জনতা গফর খানের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে "ফকির-ই-আফগান" বা 'আফগান-গৌরব' সম্মানে ভূষিত করে। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় কি গভীর-ভাবে গফর খান্ সীমান্তবাসীদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি গফর খানের দরদ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, ঠিক সেই অনুপাতেই গফর খানের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাও স্বতঃস্ফূর্ত।

মক্কা-সম্মেলন

১৯২৬ সালে হজের সময় আরবের সুলতান ইবন সাউদ মক্কায় মুসলমানদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান সমাজের উপযোগী কোন কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে পৃথিবীর মুসলমানদের সজ্ঘবদ্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্যই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। গফর খানও সেই সময় এই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সহিত নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়। ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধিগণের অদ্ভুত মনোবৃত্তির ফলে অবশ্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত পণ্ড হইয়া যায়।

হজ-যাত্রা-শেষে গফর খান্ ইরাক, ইরান, প্যালেস্টাইন ও আরবের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সেই সকল মুসলমান রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনায় অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান লাভ করেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্তায় তিনি বুঝিতে পারেন যে, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নের সহিত আজ পৃথিবীর অর্ধেক

লোকের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত। এই সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতার উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটেনকে সেই সঙ্গে আরও বহু রাষ্ট্রকে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। ব্রিটেন তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার ও সম্পদ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অগণিত রাষ্ট্রকে তাহার করতলগত করিয়া রাখিবার জন্য ভারতের সহায়-সম্পদ্, ভারতের লোকবল ও ঐশ্বর্যবল নিয়োগ করিয়াছে। ভারতের সহায়-সম্পদ্ কেবলমাত্র বিগত মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ও সম্প্রতি যে মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে সেই দুই মহাযুদ্ধেই নিয়োজিত হইয়াছে এরূপ নহে ;—পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা, চীন ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানেও ব্রিটেনের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বহুবার ভারতের লোকবল ও ঐশ্বর্যবল নিয়োজিত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও আফগানিস্থান, আরব, ইরান, ইরাক ও তুরস্কের বিরুদ্ধেও ব্রিটেনের স্বার্থের খাতিরে ভারতীয়দের যুদ্ধে লিপ্ত করা হইয়াছে।

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গফর খানের কর্মপ্রচেষ্টা প্রধানতঃ ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত অর্ধস্বাধীন (Semi-independent) মুসলমান রাষ্ট্রসমূহে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁহার দৃষ্টিপথ প্রসারিত করে। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পৃথিবীর সমগ্র মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা জাতীয়তার ভাব দেখা দিতেছে। সে সময় তুরস্কের খিলাফত কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে ; এবং আতাতুর্কের নেতৃত্বে সেস্থানে শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইরান ও আরব শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী নেতা রেজা শাহ্ ও ইবন সাউদের হাতে আসিয়াছে। এদিকে জগলুল পাশার নেতৃত্বে

অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে 'মিশরীয় দল' নামে একটি সর্বদলীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই মিশরীয় দলে সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া গফর খান্ বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সমগ্র হিন্দুস্থানের স্বার্থের জন্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবশ্যকতা যে কতখানি তাহা তিনি সবিশেষ উপলব্ধি করেন। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধনে গফর খানের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা আজ কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে। গফর খান্ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া হানাহানি ও রেষারেষি চলিলেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সমস্তই সাময়িক, এবং তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন সেই পথেই একদিন মুসলমান সমাজের কল্যাণ আসিবে, সমগ্র হিন্দুস্থানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইবে।

পুক্‌তুন্ জির্‌গা

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে খান্ আবদুল গফর খান্ তাঁহার সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া এক নূতন কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে 'পুক্‌তুন্ জির্‌গা' (আফগান যুব-সঙ্ঘ) নাম দিয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। তাঁহার সহকর্মী ও তাঁহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃতবিদ্য ও উৎসাহী ছাত্রদের লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হয়। শিক্ষার প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছাড়াও তিনি পাঠানদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নূতন কর্মপ্রণালী জনপ্রিয় করিবার জন্য গফর খান্ 'পুক্‌তুন্' নাম দিয়া পুশ্‌তো ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি পাঠানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিয়া তোলে।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার

এই নূতন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কর্মপদ্ধতি আরও শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে গফর খান্ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দলের সহিত 'খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার' (খোদার দাস) নাম দিয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ গঠন করেন।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার দলভুক্ত হওয়ার পূর্বে সদস্যদের নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে হয় ঃ—

(১) আমি পবিত্র মনে এবং সত্যনিষ্ঠচিত্তে আমার নাম সঙ্ঘ-তালিকাভুক্ত করিতেছি।

(২) মাতৃভূমির জন্য আমি আমার সুখ, ঐশ্বর্য ও জীবন উৎসর্গ করিব।

(৩) আমি দলীয় বিরোধ, ঈর্ষা ও ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিব এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সহায় হইব।

(৪) আমি অন্য কোন দলের সদস্য-তালিকাভুক্ত হইব না এবং বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আমার দল সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে আরোপিত দোষ-ত্রুটি খণ্ডনার্থে আমি কিছু উচ্চবাচ্য করিতে পারিব না।

(৫) আমি সর্বদা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ মানিয়া চলিব।

(৬) আমি সর্বদা অহিংসার পথ অনুসরণ করিয়া চলিব।

(৭) আমি মানব-সেবায় আত্মনিয়োগ করিব এবং আমার দেশ ও ধর্মের মুক্তিসাধন করাই আমার লক্ষ্য হইবে।

(৮) আমি সদা সৎপথে চলিব এবং সজ্ঞানে কোন অন্যায় করিব না।

(৯) আমি তাঁহার (খোদার) নামে যে কাজ করিব, কখনই তাহার জন্য পুরস্কার প্রত্যাশা করিব না।

(১০) লোকদেখানো বা লাভ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতি না তাকাইয়া খোদাকে সন্তুষ্ট করাই আমার সকল প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হইবে।

১৯২৯ সালে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সঙ্ঘ গঠন ও ১৯৩০ সালে সীমান্ত-প্রদেশে আকস্মিক বিরাট গণ-অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের প্রসারকে কয়েকশ্রেণীর লোক সন্দেহের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। তাহারা পাঠানদের এই আন্দোলন সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যাহা ভ্রান্ত তাহা টিকিতে পারে না। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে পাঠানদের বিরাট আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ভারতের প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী নরনারীর মনে চির-উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ছাড়াও তাহাদের সংগ্রাম-সংগীত হইতে আমরা তাহাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানিতে পারি।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘের সংগ্রাম-সংগীত

We are the army of God,
Of death and wealth care-free,
We march, our leader and we,
Ready to die.
In the name of God we march
And in His name we die,
We serve in the name of God,
God's servants are we.

God is our king,
And great is He,
We serve our Lord,
His slaves are we.
Our country's cause,
We serve with our breath,
For such an end,
Glorious is death.
We serve and we love,
Our people and our cause,
Freedom is our aim,
And our lives are its price.
We love our country,
And respect our country,
Zealously protect it,
For the glory of the Lord.
By canon or gun undismayed,
Soldiers and horsemen,
None can come between
Our work and our duty.

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার গঠনের উদ্দেশ্য

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাদশা খানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাদশা খান্ বলিয়াছেন—"আমি আমার স্বদেশবাসীর জাতীয় ইতিহাস যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি। উহা জয়যাত্রা ও বীরত্বের কাহিনীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি

দোষক্রটিও আছে। গৃহবিবাদ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সর্বদাই তাহাদের আত্মত্যাগের মহত্ত্বকে অবনমিত করিয়াছে। তাহাদের অন্তর্নিহিত দোষক্রটিই তাহাদের অধিকারচ্যুত করিয়াছে, অন্য কোন কারণেই উহা ঘটে নাই। কারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেহই তাহাদের সমকক্ষ নহে.........আমি পাঠানদের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া সংগঠন করিতে চাই এবং এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া এমন এক জাতি গঠন করিতে চাই, যে জাতি দেশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে।" (ফ্রন্টিয়ার স্পীক্‌স্)

এই জাতিগঠন-আন্দোলনের অগ্রদূত—খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার দল—বাদশা খানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় এই জাতিগঠনের মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। মানবসেবা তাহাদের জীবনের ব্রত, খোদার নির্দেশ মানিয়া চলা তাহাদের লক্ষ্য, অহিংসা তাহাদের আদর্শ, মানবতার মুক্তি তাহাদের কাম্য, কর্ম তাহাদের ধর্ম এবং চরখা তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অস্ত্র।

এই নূতন দল ও তাহাদের কর্মপন্থা পাঠানদের মধ্যে সাড়া আনিয়া দেয় এবং সীমান্ত-প্রদেশের সর্বত্র ইহার শাখা-উপশাখা ছড়াইয়া পড়ে। স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলেই একধরনের উর্দি পরিধান করিত। তাহাদের উর্দির রং লাল বলিয়া ইংরাজ তাহাদের "রেড্ শার্টস্" বা 'লাল কোর্তা'র দল নামে অভিহিত করিয়াছে। ইহাতে কয়েক শ্রেণীর লোকের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তাহাদের আন্দোলনের মূলে রুশিয়ার 'রেড্‌স্'দের প্রেরণা আছে এবং তাহারাই এই আন্দোলন পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করে। যাহারা এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হয়, তাহাদের চিন্তাশক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর সর্বত্র আজ যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-পরিধির সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা উপলব্ধি করা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে। তাহারা কেবল জানে,

কি করিয়া মানুষকে শোষণ করা যায় এবং তাহাদের স্বার্থ এড়াইয়া চলিতে হয়।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলনের কতকগুলি অভিনব পদ্ধতি আছে যাহা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে খান্ আবদুল গফর খান্ ব্যাখ্যা-মূলক নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা করিয়া দর্শকের সম্মুখে তাঁহার আন্দোলনের তাৎপর্য প্রাণবন্ত করিয়া ধরেন। দুর্ধর্ষ পাঠানদের অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি পাঠানদের এমন করিয়া গঠন করিতে চাহেন, যাহাতে তাহারা নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে। গফর খানের এই অভিনব প্রচেষ্টায় বিশেষ ফল দেখা দেয়। এই অভিনয় দেখিবার জন্য বহু দর্শকের সমাগম হইতে থাকে। অভিনয়শেষে তাহারা হৃদয়ে প্রেরণা ও চোখে-মুখে এক নূতন দীপ্তি লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

গফর খান্ বহুদিন ধরিয়া সীমান্ত-প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। সীমান্ত-প্রদেশের উত্তরে পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁহার আন্দোলনের নূতন পদ্ধতি জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বহুদিন ধরিয়া ঐ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্নস্থানে কিছু কিছু করিয়া নিঃস্বার্থ কর্মীরও সন্ধান লাভ করেন। এই সকল কর্মীরা স্ব স্ব অঞ্চলে গফর খানের আদর্শ প্রচারের ব্রত গ্রহণ করে।

প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া দেশবাসীর শিক্ষা ও সমাজ-জীবনে সর্ববিধ কল্যাণ-সাধনে গফর খান্ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। হিংসার পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তিনি পাঠানদের শ্রম ও প্রেমের পথে পরিচালিত করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশকে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯২০ সালের ন্যায় ১৯৩০ হইতে ১৯৩২ সালও ভারতের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। ১৯২৫ সাল হইতেই গফর খান্ ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেসের অধিবেশনসমূহে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন এবং সব সময়ই তাঁহার চেষ্টা ছিল—জাতীয় আন্দোলনের সহিত সীমান্ত-আন্দোলনের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা। যদিও তিনি অনেক পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন, তথাপি বহু পূর্ব হইতেই কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই গফর খান্ তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার দলকে কংগ্রেসের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইতে চেষ্টা করেন এবং কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত তাল রাখিয়া তাঁহার কর্মপদ্ধতিও প্রয়োজনানুসারে অদল-বদল করিয়া লন।

লাহোর অধিবেশন

১৯২৯ সালের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন সীমান্ত প্রদেশের আন্দোলনকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে। সীমান্ত প্রদেশ হইতে লাহোরের দূরত্ব খুব বেশী নহে। পাঠানদের মধ্য হইতে বহু লোক প্রতিনিধি, দর্শক ও শ্রোতারূপে বাদশা খানের সহিত এই অধিবেশনে যোগদান করে। লাহোর অধিবেশনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নব্য-তন্ত্রের নায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাপতির অভিভাষণে ভারতবাসীর শক্তি-সামর্থ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি নিজে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, কিন্তু সে পথে হিংসার স্থান নাই। তাঁহার মতে জাতীয় প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য হইল, "সত্যকার ক্ষমতা অধিকার। আমি মনে করি না—ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মত কোন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা সত্যকার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিব। সত্যকার ক্ষমতা যে পাওয়া গিয়াছে তাহার পরীক্ষা হইবে তখনই যখন ভারতস্থিত বিদেশী সৈন্য ও ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদেশী কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইবে।"

কিন্তু এই বৎসরটি আর একটি কারণেও বিশেষ স্মরণীয় হইয়া আছে। এইবার কংগ্রেসের মূল বিষয় হইল স্বাধীনতা প্রস্তাব। বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে স্বাধীনতা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। অধিবেশনের কর্মসূচী ও জাতীয় আবহাওয়া পাঠানদের মন আকৃষ্ট করে এবং স্বদেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য তাহাদের অন্তরে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে।

সীমান্ত সংগ্রামের হোমানল দমনে সরকারী অত্যাচার

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইলে সীমান্ত-প্রদেশে খান্ আবদুল গফর খান্ তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনী লইয়া এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। লবণ আইন অমান্য, বিদেশী বস্ত্র পরিহার, পরিষদ ত্যাগ, কর-বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতি এইবারের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অঙ্গীভূত করা হয়। অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনী মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে বদ্ধপরিকর। তাহারা চরম আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত। চরম দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হইয়াও তাহারা পশ্চাদ্‌পদ হয় না।

সরকার বিভিন্ন অর্ডিনান্স জারী করিয়া সর্বপ্রকারে আন্দোলন দমনে উদ্যোগী হইলেন। এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ভারতের বহু স্থানে উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ও সৈন্যদল বহুবার গুলীবর্ষণ করে। সরকারী অত্যাচারের বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে ১৯৩০ সালের ২৩শে এপ্রিল পেশোয়ারের রাজপথে সৈন্যদের নির্মম অনাচারের কথা কেহ বিস্মৃত হইবে না। স্বাধীনতার যজ্ঞবেদীতে সংগ্রামের হোমানলে শত শত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারের গৌরবময় আত্মাহুতির কাহিনী জাতির অন্তরে রক্তাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্ত সত্যাগ্রহীদের উপর সৈন্যদের

নির্মম গুলীবর্ষণে পেশোয়ারের রাজপথ রক্তস্নাত হয়। শত শত পাঠান নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রাণদান করে। এই রক্তস্নানের মধ্য দিয়া পাঠানরা প্রমাণ করে যে, মহাত্মা গান্ধীর শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী সৈনিকদের তুলনায় তাহারা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। সীমান্তে গফর খানের প্রচেষ্টা সার্থক হয়। এই দিনই গাড়োয়ালী সৈন্যদল শান্ত ও নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীচালনা করিতে অস্বীকার করে। তাহার মূল্যস্বরূপ তাহাদের কোর্ট মার্শালের শাস্তি বহন করিতে হয়। সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর এই দিনটি সীমান্তের অধিবাসিগণ শহীদ-দিবসরূপে পালন করিয়া আসিতেছে। শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পেশোয়ারে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। ২৩শে এপ্রিল সহস্র সহস্র খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার রক্তবসনে অনাবৃত মস্তকে শোভাযাত্রা সহকারে পেশোয়ারের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া বাদশা খান্ ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হন। স্মৃতিস্তম্ভের পার্শ্বে সমবেত হইয়া তাঁহারা শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অতঃপর শোভাযাত্রাটি বাদশা খানের অনুসরণ করিতে করিতে শহরের বাহিরে নির্জন প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হয়। সেখানে গফর খানের সভাপতিত্বে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারগণ শহীদদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে এবং গফর খান্ তাহাদের চরম আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

সরকারী অনাচারের স্বরূপ

২৩শে এপ্রিল পেশেয়ারে হত্যাকাণ্ডের পরদিনই গফর খান্‌কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সঙ্ঘ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। সীমান্ত-প্রদেশে রিসুলপুর নামক স্থানে এক অপরিজ্ঞাত সেনানিবাসে ক্রাইম রেগুলেশন্ আইনে গফর খানের বিচার হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই বিচারের প্রহসন সমাধা

হইলে তাঁহাকে গুজরাট সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। 'পুক্‌তুন্' নামে তিনি যে পত্রিকা পরিচালনা করিতেন গভর্নমেণ্ট তাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। সীমান্ত-প্রদেশের পরবর্তী কিছুকালের ইতিহাস বড়ই দুর্যোগ-ঘন। গুলীবর্ষণ, প্রহার ও অন্যান্য নানা উপায়ে সীমান্তের অধিবাসীদের উপর পুলিস ও সৈন্যদের অত্যাচার অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদের পুরনারীর ইজ্জৎ নষ্ট করা হয়। পুলিস ও সৈন্যেরা গ্রামবাসীদের শস্যক্ষেত্র ও মজুত শস্য নষ্ট করিয়া দেয়। গ্রাম আক্রমণ করিয়া সৈন্যরা নানাপ্রকারে গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন ও বহুভাবে তাহাদের লাঞ্ছিত করে। তাহাদের সভা বেপরোয়া গুলীবর্ষণে ভাঙ্গিয়া দেয়; তাহাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের প্রাণনাশ করে। তাহাদের নিষ্ঠুর আচরণে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। উন্মত্ত সৈন্যরা না আছে এমন অত্যাচার করে নাই। তাহারা গৃহের ছাদ হইতে পর্যন্ত লোকদের নীচে ফেলিয়া দিয়াছে এবং শিশুদের নির্দয়ভাবে প্রহার ও হত্যা করিয়াছে।

জনৈক আমেরিকান পর্যটক এই অত্যাচারের উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, "লালকোর্তাদের গুলী করিয়া হত্যা করা সীমান্তপ্রদেশে ব্রিটিশ সৈন্যদের নিকট তামাসার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল।" এই দুর্ধর্ষ পাঠানজাতি, যে জাতি প্রতিশোধ না লইয়া অন্নজল গ্রহণ করিত না, সেই জাতি কি করিয়া এইরূপ অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাইল? চরম প্ররোচনামূলক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও মুহূর্তের জন্য তাহারা অহিংসার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা হারায় নাই। দুর্বার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তাহারা প্ররোচিত হয় নাই। শান্তিপূর্ণভাবে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের মহান্ ব্রতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

সৈন্য ও পুলিসের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণ

গফর খানের শিক্ষা ও প্রেরণা ১৯৩০ সালে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলনে অদ্ভুত ইন্দ্রজালের মত কাজ করিয়াছে। অহিংসার প্রতি পাঠানদের আনুগত্য এত প্রবল যে, এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যে ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তাহারা বিন্দুমাত্রও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। চার্‌সাদ্দা মহকুমার পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ মিঃ জেমিসনের লোমহর্ষণ অত্যাচারের কাহিনী কেহ বিস্মৃত হইবে না। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের উপর এই শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গবের পাশবিক আচরণের তুলনা সভ্যজগতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের নগ্ন করিয়া অতঃপর নির্দয়ভাবে প্রহার করাই ছিল তাঁহার রীতি। তিনি তাহাদের গোচরে তাহাদের প্রিয় নেতা বাদশা খানের উদ্দেশে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় গালি-গালাজ করিতেন। বাদশা খানের উদ্দেশে বর্ষিত অত্যন্ত হীন মন্তব্যসমূহে সায় না দিলে সেই পুলিস কর্মচারীর হাতে তাহাদের আর লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা থাকিত না। কোন সময় তাহাদের ধরিয়া নগ্ন অবস্থাতেই দূষিত ও নোংরা জলাশয়ে নিক্ষেপ পর্যন্ত করা হইত।

নগ্ন অবস্থায় প্রহার

একবার উটামানজাইয়ে ৩ জন খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। অতঃপর তাহাদের উর্দি খুলিয়া ফেলিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। এই বর্বর আচরণে মুহূর্তের জন্য তাহাদের সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং রিভলভার আনিবার উদ্দেশ্যে তাহারা গৃহাভিমুখে ছুটিয়া যায়। এই সময় অকস্মাৎ তাহাদের অধিনায়কের কণ্ঠস্বর তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠে—"তোমাদের ধৈর্যের বাঁধ কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে?

মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকিবে বলিয়া তোমরা যে বাদশা খানের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!" এই কথা শুনিবামাত্র তাহাদের সংবিৎ ফিরিয়া আসে এবং পরক্ষণেই তাহারা অত্যাচারীর সমস্ত নির্যাতন নীরবে সহ্য করে। ইহার পর আক্রমণকারীরা তাহাদের উলঙ্গ করিয়া পদাঘাতে ও বেওনেটের খোঁচায় তাহাদের সমস্ত দেহ রক্তাক্ত করে। তারপর কার্যসিদ্ধির পাশবিক উল্লাসে সেস্থান হইতে চলিয়া যায়।

সভাপণ্ডের চেষ্টা

গফর খানের গ্রামের বাড়ীতে একদিন একটি সভা হইবে খবর পাইয়া এক পুলিসবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। তাহারা প্রথমতঃ ভয় দেখাইয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। সমবেত পাঠানরা সভা করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। অতঃপর পুলিস তাহাদের উপর গুলীবর্ষণের অভিপ্রায়ে রাইফেল উদ্যত করে। ঠিক এই সময়ে সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখে, জনতার মধ্য হইতে একটি বালিকা দৌড়াইয়া উদ্যত রাইফেলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায় এবং চিৎকার করিয়া বলে, "আগে আমাকে হত্যা কর, তারপর আমার পশ্চাতে যাহারা আছে তাহাদের হত্যা করিও।" ইহার পর পুলিস সভার কাজে বাধা না দিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া যায়।

আর একবার মর্দান জেলার রুস্তমে গফর খান্ একদিন এক সভায় বক্তৃতাদানের জন্য উপস্থিত হইলে পুলিস আসিয়া বাধা দেয়। পুলিস সমবেত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারের সভা ভাঙ্গিয়া শান্তিপূর্ণভাবে চলিয়া যাইতে বলে, অন্যথায় তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করা হইবে বলিয়া ভয় দেখায়। সভাস্থল নিস্তব্ধ। প্রত্যেকটি প্রাণীই দৃঢ়সঙ্কল্প। গফর খান্ সমস্ত ফলাফলের জন্য প্রস্তুত হইয়া বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসনে দণ্ডায়মান হন। গফর খানের সাহস ও

সমবেত পাঠানদের দৃঢ়তা দেখিয়া পুলিস কর্তৃপক্ষের উষ্মা কিছুটা দমিত হয়। তাহারা দাঁড়াইয়া দেখে বাদশা খানের বক্তৃতা শুনিবার জন্য পাঠানদের কি অপরিসীম উৎসাহ, কি আগ্রহ!

পদাঘাতে আহত শিশু হত্যা

উৎপীড়নের নানারূপ কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হয়। কখনও কখনও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সশস্ত্র সৈন্যসারির মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া যাইতে বাধ্য করা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর সৈন্যদের নির্দয় পদাঘাত, গুলী ও বেওনেটের খোঁচা চলিত। মিঃ আইসমঙ্গার-এর জঘন্য আচরণ ভুলিয়া যাওয়া ও ক্ষমা করাও কি সম্ভব? পেশোয়ারে কিশাখানির রাজপথে আহত শিশুদের পর্যন্ত তিনি পদাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কত আহত শিশুর আকুল ক্রন্দন এই বর্বরের পদাঘাতে অন্তিমের বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি ডাঃ খান্ সাহেব গুলীর আঘাতে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করিতে গেলে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হয়। এই সমস্ত অত্যাচারের চিহ্ন বহন করিয়া বহু অক্ষম ও বিকৃতাঙ্গ পাঠান এখনও বাঁচিয়া আছে।

বিভিন্ন স্থানে অত্যাচার—গুলীবর্ষণ, গৃহদাহ ও ছাদ হইতে নিক্ষেপ

কোহাট, বান্নু, ডেরা-ইসমাইল খাঁ প্রভৃতি স্থানেও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে। নির্যাতনের নানারূপ প্রক্রিয়ার মধ্যে শীতের কনকনে ঠাণ্ডার ভিতরে তাহাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়া ততোধিক ঠাণ্ডাজলে নিক্ষেপ করা হইত।

প্রতিবৎসর নববর্ষে সৈন্যদের উৎসব পেশোয়ার জেলার মাসোখেল ও মহম্মদির অধিবাসীদের মনে তাহাদের উপর সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯৩১ সালে নববর্ষের দিন উৎসবোন্মত্ত সৈন্যদল ঐ দুইটি গ্রাম আক্রমণ করে এবং নানারূপ অত্যাচার ও অনাচারের দ্বারা গ্রামবাসীদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলে। ১৯৩০ সালে ২৮শে মে মর্দান জেলার টক্কর্ গ্রামে হানা দিয়া সৈন্যরা বহু খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারকে হত্যা করে। সোয়াবিতে সৈন্যরা বহু শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে এবং তেল ঢালিয়া সংগৃহীত শস্য খাদ্যের অনুপযোগী করিয়া দেয়। উটামানজাই গ্রাম খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্র। সৈন্যরা এই স্থানের অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। সশস্ত্র আক্রমণকারীরা সর্বপ্রথম গ্রামখানি ঘেরাও করে। অতঃপর গ্রামবাসীদের উপর গুলীবর্ষণ ও নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাকে। গ্রীষ্মের কঠোর উত্তাপে তাহাদের রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। ভারী পাথর বহন করিয়া তাহাদের পাহাড়ে উঠিতে বাধ্য করা হয়। উন্মত্ত সৈন্যরা নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরিয়া বলপূর্বক গৃহের ছাদ হইতে ফেলিয়া দেয়। তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেয় ও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সঙ্ঘ-অফিস ভস্মীভূত করে।

পণ্ডিত নেহরুর উক্তি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গফর খানের মুখে সীমান্ত-প্রদেশের এই সমস্ত অত্যাচারের কথা শুনিয়া ঐ সকল ঘটনার যথাযথ প্রচার না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল ১৯৪২ সালের ১৫ই জানুআরি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্ধা অধিবেশনে সীমান্ত-প্রদেশে যে সমস্ত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন,—"ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আমাদের জনগণের সমস্ত

পটভূমিকা ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অত্যাচার ও পরে জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্যাতনের কথা আমাদের মনে পড়ে এবং ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দে সীমান্ত-প্রদেশে যে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, সে সম্পর্কেও আমি সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি। এই সমস্ত ঘটনা কি কেহ ভুলিতে পারে?”

পেশোয়ার তদন্ত কমিটি

সীমান্ত-প্রদেশে এই সকল শোচনীয় ঘটনাবলীর বিস্তারিত তদন্তের জন্য কংগ্রেস স্বর্গত বিঠলভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে ‘পেশোয়ার তদন্ত কমিটি’ নাম দিয়া একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির তদন্তের ফল প্রকাশের অল্পকাল পরই গভর্নমেণ্ট তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

‘প্যাটেল রিপোর্ট,’ ‘ইণ্ডিয়া লীগ ডেলিগেশনের রিপোর্ট’ ও ফাদার বেরিয়ার এলুইনের ‘সীমান্ত সম্পর্কে সত্য ঘটনা’ মারফত সীমান্ত-প্রদেশের অত্যাচারের কাহিনী কিয়ৎপরিমাণে জনশ্রুতি লাভ করিয়াছে।

সীমান্তবাসীদের বীরত্ব ঃ বাদশা খানের উপর অবিচলিত বিশ্বাস

নির্ভীক চিত্তে সমগ্র প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পাঠানগণ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, ভারতের অহিংস-সংগ্রামের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই অল্প। বাদশা খানের উপর পাঠানদের অপরিসীম বিশ্বাস, তাঁহার আদর্শে তাহাদের আন্তরিক নিষ্ঠাই সুমহান্ নির্ভরের মত তাহাদের সমস্ত অত্যাচার ও অনাচারের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি ও সাহস দিয়াছে। বিপদকে তাহারা বিপদ মনে করিয়া মুসড়াইয়া পড়ে নাই। মুহূর্তের জন্যও তাহারা বিশ্বাস

হারায় নাই। শত শত লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মধ্যেও সংগ্রামের নূতন পদ্ধতির প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অবিচলিত ছিল। তাহাদের মনে একমাত্র বিশ্বাস, বাদশা খান্ কখনও তাহাদের বিপথে চালিত করিতে পারেন না। তাঁহার শিক্ষা, ধর্ম, কর্ম ও চিন্তা সমস্তই স্বদেশের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত। তাঁহার জীবন মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত। তাঁহার শিক্ষা পাঠানদের নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। গফর খান্ পাঠানদের অহিংসামন্ত্রের দীক্ষাগুরু। সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা, অহিংসার প্রতি তাঁহার আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে স্বতঃস্ফূর্ত। পাঠানদের বিশ্বাস বাদশা খান্ একজন পয়গম্বর। মানবের মুক্তির জন্য সত্য ও প্রেমের বাণী লইয়া তিনি তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে পুকুরের জল পান করেন, পাঠানদের নিকট সেই জলাশয়ের জল পবিত্র হইয়া উঠে। তাহাদের বিশ্বাস সেই জলপানে দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হইবে। তিনি যে জলাশয়ের জল পান করিতেন, সেই জল লইবার জন্য সেখানে রীতিমত ভীড় জমিয়া যাইত।

সরকারের মিথ্যা প্রচারকার্য

সীমান্ত-কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, কমিউনিস্ট রুশদের সহিত 'লালকোর্তাদের' মিতালি আছে এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন হইতে গফর খানের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সমস্ত সংগঠন ও শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই সীমান্তের কর্তৃপক্ষ এই অজুহাতের সৃষ্টি করেন। সমাজতন্ত্রবাদ ভারতবর্ষ পছন্দ করে। কারণ তাহাদের বিশ্বাস অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাদের জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান হইবে। সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর জন্যই ভারতবাসী সমাজতন্ত্রবাদের তারিফ করে।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়াই রুশিয়ার সহিত তাহাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এক্ষণে নিঃসন্দেহে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রকার সংস্রব নাই, বা কোনদিন ছিলও না এবং গভর্নমেণ্ট এইরূপ মিথ্যা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়াছেন।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের কংগ্রেসে যোগদান

১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সীমান্ত-প্রদেশের সমস্ত বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়। এই দুই বৎসর চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সীমান্তবাসিগণ তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এই সময় সীমান্তের ৩ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রদেশের বাহিরে প্রভাবসম্পন্ন মুসলমান নেতাদের পরামর্শ ও সাহায্য চাহিবার উদ্দেশ্যে বাহির হন। তাঁহারা খ্যাতিসম্পন্ন বহু মুসলমান নেতার সহিত দেখাশুনা, আলাপ-আলোচনা করেন, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে ঠিক আন্তরিক সহানুভূতি বা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান না। অতঃপর তাঁহারা মিঞা ফজল-ই-হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সীমান্ত-প্রদেশের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং এই অবস্থা-বিপর্যয়ে তাঁহাদের কি কর্তব্য সে সম্পর্কে তাঁহারা পরামর্শ চাহেন। ফজল-ই-হোসেন তাঁহাদের বলেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে মুসলমান নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে তাঁহাদের সাহায্য আশা করা বৃথা। হয় তাঁহারা নিজেরাই তাঁহাদের বিপদের সম্মুখীন হউন, আর তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে এ সম্পর্কে তাঁহারা কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। যদি কংগ্রেস সীমান্ত-প্রদেশের বিপদকে বৃহত্তর জাতীয় বিপদের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সীমান্ত-সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া তাঁহার

বিশ্বাস। স্যার ফজল-ই-হোসেন তাঁহার স্বধর্মীদের ভালরূপেই চিনিতেন এবং তাঁহাদের সমর্থন যে কোন্ পক্ষে তাহাও তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না।

অতঃপর সীমান্ত-প্রদেশের এই তিনজন নেতা মুসলমান নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা না দেখিয়া অগত্যা কংগ্রেসের দরজায় গিয়া ঘা দিলেন। সীমান্ত-আন্দোলনের সহিত কংগ্রেস পূর্ণ সহানুভূতি জানায় এবং নেতৃবৃন্দ গফর খানের আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। বাদশা খান্ তখন গুজরাট জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জানান হয়। তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনীকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৩ই আগস্ট অধিবেশনে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এইরূপে সীমান্তের খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন বৃহত্তম ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়।

গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলাফল ঃ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার

গান্ধী-আরুইন চুক্তি-সম্পাদনের পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয় এবং যাহারা হিংসাত্মক কার্যের জন্য বন্দী নহে এইরূপ সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। খান্ আবদুল গফর খান্‌ও এই সময় মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু গান্ধী-আরুইন-চুক্তি অধিক কাল স্থায়ী হয় না। করাচী অধিবেশনের পর নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়া যান এবং কংগ্রেস কমিটি গঠন করিয়া সংগঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করা গঠনমূলক কার্যের অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত স্থানে কর-বন্ধ আন্দোলনের জন্য সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ ছিল, সে সকল স্থানে পুনরায় যথারীতি কর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেসীদের এই সমস্ত কাজ আমলাতন্ত্র ভাল চোখে দেখেন না।

কংগ্রেসের কর্তৃত্ব বা মর্যাদা বাড়ে, তাঁহাদের ইহা মোটেই কাম্য নহে। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রেই আবার সরকারী জুলুম আরম্ভ হয়। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারের স্বাভাবিক কর্মসূচীর মধ্যেও পুলিস হস্তক্ষেপ আরম্ভ করে। গান্ধী-আরুইন-চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই আবার সহস্র সহস্র কর্মী কারারুদ্ধ হন। আবতুল গফর খান্ ও ডাঃ খান্ সাহেবও পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ডাঃ খান্ সাহেবকে নৈনী সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়। গফর খান্‌কে বিহারে হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে ১৯৩৪ সালের শেষভাগ পর্যন্ত তাঁহারা কারারুদ্ধ থাকেন। ডাঃ খান্ সাহেবের পুত্র সাহুল্লা খান্‌কেও গভর্নমেণ্ট গ্রেপ্তার করেন। তাঁহাকে বারাণসী জেলে আটক রাখা হয়। ডাঃ খান্ সাহেব পণ্ডিত নেহরুর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং গফর খান্ মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিবার জন্য বোম্বাই রওনা হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় গভর্নমেণ্ট উভয়কেই গ্রেপ্তার করেন।

গোল টেবিল বৈঠক

১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে পরপর হুইটি গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হয়। কিন্তু এই বৈঠকে বিশেষ কোন ফল হয় না। প্রথম বৈঠকে সরকার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় হইতে এমন সব প্রতিনিধি বাছাই করিয়া নেন যাহারা নিজ স্বার্থ, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ ছাড়া জাতীয় স্বার্থের কথা কোনকালে চিন্তাও করে নাই। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত থাকেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও এই বৈঠকে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রাজস্ব ও বাণিজ্য প্রভৃতি

সম্পর্কে ভারতবর্ষের মতামত বিবৃত করেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবারও কংগ্রেস তথা ভারতের মূল দাবি এড়াইয়া যান। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের ফলে সীমান্ত-প্রদেশকে গভর্নর-শাসিত প্রদেশের মর্যাদায় উন্নীত করা ছাড়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না। ১৯৩৩ সালে সীমান্ত-প্রদেশ গভর্নর-শাসিত প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়।

ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন

১৯৩৩ সালে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হয়। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে মূল দাবি এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং সীমান্ত-প্রদেশের অনেক বিশিষ্ট নেতা তখন পর্যন্ত কারারুদ্ধ হইয়া আছেন। এইরূপ অবস্থায় সীমান্তের অধিবাসিগণ প্রাদেশিক গভর্নরের সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করা নিরর্থক হইবে বলিয়া মনে করে। সুতরাং এই নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহই দেখা যায় না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই ভোট দেয়। চারসাদ্দাতে মাত্র ১ জনকে ভোট দিতে দেখা যায়। এই নির্বাচনের ফলাফল যে কি দাঁড়াইবে তাহা বুঝা শক্ত নহে। এই নির্বাচনের ফলে চরম প্রতিক্রিয়াশীল একদল লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ৬ জন ইংরাজ ও একজন ভারতীয়, স্যার আবদুল কায়ুম খান্‌কে লইয়া সীমান্ত-প্রদেশে একটি ভারতীয় মন্ত্রী-পরিষদ্ গঠিত হয়।

আইন-অমান্য স্থগিত

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি মারফত আইন-অমান্য-আন্দোলন বন্ধ রাখিয়া জাতিগঠন-মূলক কর্মপদ্ধতি অনুসরণের উপর বিশেষ জোর দিতে নির্দেশ দেন।

ইহার পর পণ্ডিত মালব্যজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের পাটনা অধিবেশনে আইন-অমান্য-আন্দোলন স্থগিত রাখা সম্পর্কে মহাত্মাজীর অনুরোধ সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে সরকারের পক্ষে দমননীতি অনুসরণের আর বিশেষ কোন হেতু রহিল না। ১৯৩৪ সালে ১২ই জুন তারিখে অধিকাংশ কংগ্রেস কমিটির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি এবং বাঙ্গালা ও গুজরাটের বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর তখনও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। তবে রাজবন্দীদের সকলকেই একে একে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে গফর খান্ মুক্তি লাভ করেন। ডাঃ খান্ সাহেবও এই সময় মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু উভয়েরই পাঞ্জাব অথবা সীমান্ত-প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া গভর্নমেণ্ট এক আদেশ জারী করেন।

গফর খানের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ

জেল হইতে বাহির হইয়া গফর খান্ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। এই সময় নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা ছাড়াও ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানিবার আগ্রহবশতঃ তিনি সুদূর পল্লী-অঞ্চলসমূহও পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। এই সময় ভারতের জনসাধারণ তাঁহাকে জানিবার সুযোগ লাভ করে। লোকের সহিত মিশিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। তিনি সদাহাস্যমুখে সরল মনে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র নর-নারীদের সহিত কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করিতেন। তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন। তাঁহার মন শিশুর মত সরল। তিনি শিশুদের সঙ্গ ভালবাসেন। ইহা হইতে তাঁহার অন্তরের কোমল দিকটার পরিচয় আমরা পাই। তাঁহার অন্তরের আর

একটা দিক আছে—তাহা তাঁহার ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাস ও দৃঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা। এই কোমল-কঠোরে তাঁহার চরিত্র গঠিত। তাই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের প্রতিকূল আবহাওয়া ও নির্যাতনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি আজও সসম্মানে সগর্বে ভারতের মানব-সমাজে তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

আর্ত ও দরিদ্রের প্রতি গফর খানের দরদ

নির্যাতিত আর্ত দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি গফর খানের অন্তর দরদে পরিপূর্ণ। তিনি নিজেও অতি দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করেন। তাঁহার বেশভূষায়, আহার ও বাসস্থানে বিন্দুমাত্রও আড়ম্বর বা বিলাসের ছাপ নাই। তিনি মিতব্যয়ী ও একান্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। একজন দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে যাহা জোটান সম্ভব তিনি তাহার অধিক আহার করেন না। তাঁহার সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিলে নিশ্চয়ই অবান্তর হইবে না।

১৯৩৪ সালে মুক্তিলাভের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করিবার সময় তিনি বাঙ্গালা দেশেও আসেন। বাঙ্গালায় থাকা-কালীন একবার তিনি বিখ্যাত ফরওয়ার্ড ব্লকনেতা মৌলবী আশ্রাফ-উদ্দীন চৌধুরীর কুমিল্লা জেলার সুয়াগঞ্জ গ্রামের বাটীতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। চৌধুরী সাহেব তাঁহার রাজোচিত সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। তাঁহার জন্য পৃথকভাবে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী-সমূহ রন্ধনের ব্যবস্থা হয়। আহারের প্রচুর আয়োজন করা হইল, কিন্তু গফর খান্ আহারে স্বীকৃত হইলেন না। আহারের প্রাচুর্য বোধ হয় তাঁহার মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "যে দেশে অনাহারে লোক মরে, সেখানে ভাল খাদ্যসামগ্রী খাওয়ার অধিকার তাঁহাদের নাই।" চৌধুরী সাহেব তাঁহার বেদনার কারণ

বুঝিতে পারিয়া পুনরায় তাঁহার জন্য অতি সাধারণভাবে রন্ধন করাইলেন। গফর খান্ এবারে পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

গান্ধী আশ্রমে গফর খান্

এই সময় গফর খান্ ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত বহুদিন একত্র অতিবাহিত করেন। গান্ধীজী গফর খানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাহার পর হইতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এই দুই মনীষীর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। যে সময় হইতে তাঁহারা স্ব স্ব প্রেরণা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, দুইজনের কর্মক্ষেত্র ও পটভূমিকা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের উভয়ের কর্মপন্থা, আদর্শ ও চিন্তাধারার মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য দেখা যায়। অহিংসার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অহিংসার ভিত্তিতে ভারতের মূল সমস্যা সমাধানের উপর একান্ত বিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

গান্ধী নামের সার্থকতা কোথায়

সীমান্ত-গান্ধী নাম হইতে কেহ যদি গফর খান্‌কে তাঁহার অহিংস কর্মপন্থার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নিকট ঋণী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অত্যন্ত ভুল হইবে। গফর খান্ গান্ধীজীর প্রভাবে আসিয়া অহিংসার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। তাঁহার কিছুই অনুকরণলব্ধ নহে বলিয়াই দুইজনই জনপ্রিয় গণনেতার মধ্যে আদর্শগত ঐক্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিলে তবেই আমরা তাঁহার 'সীমান্ত-গান্ধী' নামের সার্থকতা খুঁজিয়া পাই। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় গফর খান্‌ও একজন

সত্যদ্রষ্টা। চিন্তাধারার স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছপ্রবাহে সত্য তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত। সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা, অহিংসার প্রতি তাঁহার আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে স্বতঃস্ফূর্ত।

কেন্দ্রীয় পরিষদে ডাঃ খান্ সাহেব

১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদে সীমান্ত-প্রদেশ হইতে একজন সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। সীমান্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস এই সদস্য-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা স্থির করিয়া ডাঃ খান্ সাহেবকে প্রার্থী মনোনীত করেন। তখন পর্যন্ত ডাঃ খান্ সাহেবের উপর হইতে সীমান্ত-প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় নাই। নির্বাচনে ডাঃ খান্ সাহেব যাহাতে জয়যুক্ত হইতে না পারেন, সেজন্য সরকার যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। কিন্তু গভর্নমেণ্টের জনসাধারণকে ভ্রান্তপথে চালনা করিবার সমস্ত অপপ্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। ডাঃ খান্ সাহেব বিপুল ভোটাধিক্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ইহার কিছুদিন পর ডাঃ খান্ সাহেবের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং তিনি পুনরায় পেশোয়ারে ফিরিয়া তাঁহার চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন। ডাঃ খান্ সাহেব কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি পরিষদে বহুবার সীমান্ত-প্রদেশ সরকারের অনুসৃত দমন-নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণ নির্বাচনের সময় পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদে থাকেন। অতঃপর তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

সরকারী দমননীতির নিন্দা ঃ গফর খান্ গ্রেপ্তার

কংগ্রেস সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখিল। ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে দমন-নীতির নিন্দা করিয়া একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হইল। জনমতও ইহার ঘোরতর বিরোধিতা করিল; কিন্তু সরকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বাঙ্গালা ও সীমান্ত-প্রদেশে বহু কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান তখনও বে-আইনী রহিয়া গেল। নেতৃবর্গও স্থানে স্থানে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। নির্বাচনের সময় গফর খান্ ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় বোম্বাইয়ে ইয়ং খ্রীষ্টান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এক সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য গফর খান্ এক আমন্ত্রণ পাইলেন। গফর খান্ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সীমান্তে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন ও আন্দোলন দমনকল্পে সরকারী অত্যাচারের নৃশংস কাহিনী তাঁহার স্বভাবসুলভ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। এই বক্তৃতার জন্য গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এইরূপ শুনা যায় যে, গফর খানের কনিষ্ঠ পুত্র ওয়ার্ধা হইতে পিতার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া গান্ধীজীর নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি এখনও বাহিরে রহিলেন, অথচ আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করা হইল, ইহার অর্থ কি?" ইংরাজ শাসকদের চোখে তাঁহার পিতা যে কি সাংঘাতিক লোক তাহা বুঝা হয়ত তাঁহার পক্ষে সে সময় ততটা সহজ হইয়া উঠে নাই।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

সুদীর্ঘ ৬ বৎসর নির্বাসন ও কারাভোগের পর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গফর খান্ স্বদেশে পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ কারালাঞ্ছনা ও নির্যাতনে নিপীড়িত, আত্মত্যাগে সুমহান্ স্বাধীনতাসাধনার এই বীর পুরোহিতকে আবার তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়া পাঠান জনসাধারণ আনন্দে, শ্রদ্ধায়, প্রেরণায় উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত

হইয়া উঠিল। বাদশা খান্‌কে তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াই তাহাদের আনন্দ। সীমান্তের অধিবাসিগণ তাঁহাকে শুধু নেতা হিসাবে নহে, নিপীড়িত জনগণের বন্ধু হিসাবেও শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে ও ভালবাসে। ফকির-ই-আফগান যে তাহাদের দুঃখের দরদী, শোকের সান্ত্বনা, বিপদের সহায়! গফর খান্ স্বদেশবাসীর মঙ্গলের প্রতীক।

স্বদেশে ফিরিবার পর পেশোয়ারে এক বিরাট জনসভায় সীমান্তবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়।

কর্মের আহ্বান

সমবেত অগণিত খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারগণ আবার তাহাদের পরম আত্মীয়ের পরিচিত কণ্ঠস্বরে কর্মক্ষেত্রে যাত্রা সুরুর ইঙ্গিত শুনিতে পাইল। সে তো শুধু বক্তৃতা নহে—সে কণ্ঠস্বর জাতিকে নূতন প্রেরণায় নূতন পথে যাত্রার আহ্বান—'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ। ওঠো জাগো'। বাদশা খান্ তাহাদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, 'বরপ্রাপ্তি' অক্ষমের জন্য নহে, সুপ্তের জন্য নহে, দুর্বলের জন্য নহে!—"ঈশ্বরের করুণায় আমি আবার তোমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের আনন্দে যোগদান করিতে পারিয়াছি। আমাদের প্রকৃত আনন্দ এখনও অনাগত ভবিষ্যতের অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে। যতদিন আমাদের লক্ষ্যে না পৌঁছিতেছি, ততদিন আমাদের সব আনন্দই নিরর্থক। আমাদের মুক্তি-আন্দোলন আজ এমন এক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যে অবস্থায় আমাদের আরও বৃহৎ আত্মত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আমার বিশ্বাস তোমরা সকলেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছ। আমার দিক হইতে আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমাদের পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দেশে প্রকৃত 'গণ-রাজ' প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আমি মুক্তি-সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে দৃঢ়সংকল্প।"

ভারত-শাসন আইন

১৯৩৫ সালে ভারত-শাসনমূলক একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন 'গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫' বা 'ভারত-শাসন আইন, ১৯৩৫' নামে পরিচিত। এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে নূতন শাসনবিধি প্রবর্তিত হয়। ১১টি প্রদেশে নূতন নিয়মে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই সময় সীমান্ত গভর্নরের প্রচেষ্টায় সীমান্ত-প্রদেশে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়; কিন্তু তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

সাধারণ নির্বাচনে বাধা-নিষেধ

সাধারণ নির্বাচনের সময় গফর খানের সীমান্ত-প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নির্বাচনী প্রচারকার্যের জন্য সীমান্ত-প্রদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া সরকার তাঁহার সীমান্ত-প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। নির্বাচন-কার্য স্বরু হইলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ভুলাভাই দেশাইকে সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারকার্যের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস কমিটিসমূহ বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় নির্বাচনী প্রচার ও নির্বাচন-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য স্থানীয় জনপ্রিয় নেতৃগণকে লইয়া একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করা এবং নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের অন্যান্যভাবে সাহায্য করা; কিন্তু দুই-একটি জেলা পরিভ্রমণ করিবার পরই তাহাদের অন্যান্য জেলা-প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে একমাত্র ডাঃ খান্ সাহেবের উপর নির্বাচন-সংক্রান্ত সমস্ত কাজের বোঝা আসিয়া পড়ে। সরকারী কর্মচারীরা খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের নির্বাচন-সংক্রান্ত সমস্ত প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপায়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন। সীমান্তে

সরকারী কর্মচারীরাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচারকার্য চালান। কিন্তু তাহাদের সমস্ত অপপ্রচার ব্যর্থ হয়। প্যাটেল ও দেশাই সীমান্ত-প্রদেশে যাওয়ার কিছুদিন পূর্বে মিঃ জিন্না তাঁহার নবগঠিত দলের জন্য সমর্থন জোগাইবার উদ্দেশ্যে সীমান্ত-প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। মিঃ জিন্নার প্রচারকার্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ কিন্তু কোনরূপ বাধা দেয় নাই। এইরূপ সুবিধা সত্ত্বেও জিন্না সাহেব পাঠানদের মন অধিকার করিতে কৃতকার্য হইলেন না। লীগ-দলপতির অনুচরবৃন্দের পাকিস্তানের জিগীর ও 'ইসলাম বিপন্নের' ধুয়া তুলিয়া সীমান্তের মুসলমান সম্প্রদায়কে দলে টানিবার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যায়।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা সীমান্তপ্রদেশের সর্বত্র সভা-শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া কংগ্রেসের বাণী প্রচার করে; কংগ্রেসের আদর্শ ও মুক্তির বার্তা পাঠানদের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। মর্দান ও সোয়াবি জেলায় নির্বাচনে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সোয়াবি জেলায় জনৈক খ্যাতিসম্পন্ন ঐশ্বর্যশালী ভূস্বামী খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার প্রার্থীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। সোয়াবি জেলায় ভোট-দাতাদের সংখ্যা প্রায় ৬০০০। সেই ভূস্বামী তাঁহার জয়লাভ সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তিনি একবার ডাঃ খান্ সাহেবের সম্মুখে সগর্বে ঘোষণা করেন, "মোট ছয় হাজার ভোটের মধ্যে তিন হাজার ভোট তাঁহার পকেটে জমা হইয়াছে।" তাহার উত্তরে ডাঃ খান্ সাহেব রসিকতা করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার পকেটে একটি ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন এবং ভোট গ্রহণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সেই ছিদ্র দিয়া পকেট হইতে সমস্ত ভোট গলিয়া পড়িয়া যাইবে।

সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা

নির্বাচনের পরে ইহা অবধারিত হইল যে, সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব। নিখিল ভারত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে গফর খানের সহিত পরামর্শের জন্য এবোটাবাদে গমন করেন। এবোটাবাদে পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। নেতৃদ্বয় খান্ আবদুল গফর খানের সহিত আলোচনা ও খোদাই-খিদ্‌মদ্-গারদের সংগঠন ও প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তথায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে পরামর্শ দেন।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে সীমান্ত-গভর্নরের প্রচেষ্টায় একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা মোটেই জনপ্রিয় হয় নাই। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের ৩রা সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে উক্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর ডাঃ খান্ সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

নূতন সূচনা

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর পাঠানদের জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নূতন পরিবর্তন সূচিত হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে সীমান্তের অধিবাসিগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। তাহাদের ধন-প্রাণ-মানের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই প্রদেশ হইতে সর্বপ্রথম দুর্নীতি-দূরীকরণে ব্রতী হইলেন। জনস্বার্থহানিকর ও অকেজো প্রতিষ্ঠানসমূহের একে একে উচ্ছেদসাধন করা হইল। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সকল

ম্যাজিস্ট্রেট নামধারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা জনহিতে লাগাইবার পরিবর্তে অপব্যবহারই করিতেন। মন্ত্রিমণ্ডলী স্থানীয় সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত সদস্য-পদগুলিও একে একে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র কৃষকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি-আইনের সংশোধন করা হইল এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও মন্ত্রিমণ্ডলী যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

সীমান্তে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও মুসলিম লীগের অসারতা

সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের পর একদল লোকের মনে যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইল, তেমনি আবার ভূস্বামী, সরকারী বেতনভুক্ কর্মচারী ও কায়েমী স্বার্থের কয়েকশ্রেণীর লোক তাহাদের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই শ্রেণীর লোকেরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে সীমান্ত-প্রদেশে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন করিল। সীমান্তে ব্যবস্থা-পরিষদে তাহাদের লইয়াই বিরোধী দল গঠিত হয়। তাঁহাদের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীও ছিল না বা তাঁহারা কোন নিয়ম-শৃঙ্খলারও ধার ধারিতেন না। নেতা বলা যায় এমন জনপ্রিয় কর্মীও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন না। জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য যাহা করা প্রয়োজন, সেরূপ কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থার একান্ত অভাববশতঃ তাঁহাদের প্রভাব কয়েক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। এই সকল লোকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল বিদেশী শাসনে তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থের পুষ্টিসাধন করা।

সংগঠন-শক্তি বা জনপ্রিয়তা কোন দিক দিয়াই সীমান্তের মুসলিম লীগ দল খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সমকক্ষ নহে। তাহারা

ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার ও বাদশা খানের বিরুদ্ধে নানারূপ কটূক্তি করিতে থাকে। কিন্তু অতীতের সেবা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতি চাহিয়া সীমান্তের অধিবাসিগণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত বাদশা খানের নেতৃত্ব মানিয়া চলে। গফর খান্ পাঠানদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বারবার বিদেশী শাসকদের রোষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় ক্লেশ ও কারাবরণ করেন। আর সেই সময় সীমান্তে স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত লীগ-দলভুক্ত নবাব, ভূস্বামী ও সরকারী চাকুরিয়ার দল তাঁহাদের অপরিমিত লালসার পরিতৃপ্তির মানসে দরিদ্র জনসাধারণের সর্বনাশসাধনে নিয়োজিত ছিলেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তা

পরবর্তী প্রায় আড়াই বৎসর সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকাকালীন মুসলিম লীগের প্রধান চেষ্টা ছিল কি করিয়া পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট করা যায়। কিন্তু তাহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ প্রসারলাভই করিতেছে।

১৯৩৯ সালের ৬ই নভেম্বর সীমান্ত-প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে যুদ্ধ সম্পর্কিত কংগ্রেসের প্রস্তাবটি বিনা বাধায় গৃহীত হয়। একমাত্র সীমান্ত-প্রদেশেই কংগ্রেসের যুদ্ধ-সম্পর্কিত প্রস্তাব বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ইহার ২ দিন পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। গ্রেটব্রিটেন মহাসমরে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষকেও সমররত দেশ বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করেন। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় পরিষদের মতামত গ্রহণও আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। উপরন্তু যুদ্ধজনিত অবস্থার অজুহাতে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও অর্ডিনান্স জারী হইতে থাকে। ব্রিটেন তথা মিত্রশক্তিবর্গ গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া সমরে অবতীর্ণ হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সময় এক বিবৃতির মারফত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কংগ্রেস গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও নাৎসীবাদের ঘোরতর বিরোধী। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে গণতন্ত্র স্বীকার করিয়া লওয়া ব্রিটেনের একান্ত কর্তব্য। সেইরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে ব্রিটেনের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে। কমিটি ব্রিটেনের নিকট হইতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবৃতির দাবি করে। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু-মহাসভা প্রভৃতির অন্যূন ৫২ জন প্রতিনিধির সহিত স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার শাসন-পরিষদ বর্ধিত করিয়া গণ-প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক শর্ত জুড়িয়া দেন যে, কংগ্রেসকে এই সদস্য-সংখ্যা ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বাহ্ণেই মিঃ জিন্নার সহিত একমত হইতে হইবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২২শে অক্টোবর কর্তৃপক্ষকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য জানাইয়া মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেয়। নভেম্বর মাসের মধ্যেই একে একে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে। সীমান্ত-প্রদেশে ডাঃ খান্ সাহেব ও তাঁহার

মন্ত্রিমণ্ডলীও পদত্যাগ করে। ইহার পর ৭টি প্রদেশে গভর্নর বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী এবারে পুনরায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন বটে, তবে এইবারের আন্দোলন নির্দিষ্টসংখ্যক কর্মীর মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলেন। তাহা সত্ত্বেও এই আন্দোলনে ওয়ার্কিং কমিটির ১১জন সদস্য সহ বহু কংগ্রেস-নেতা কারারুদ্ধ হইলেন। কংগ্রেস ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে আন্দোলন স্থগিত করে।

গফর খানের দূরদৃষ্টি

গফর খান্ ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ হইতে ইস্তফা দেন। পুণা-চুক্তি সম্পর্কে সহকর্মী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত মতানৈক্যই তাঁহার পদত্যাগের কারণ। গফর খান্ একবার যাহা ন্যায়সঙ্গত ও আদর্শসম্মত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন না। আদর্শের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠার জন্য বাহিরের প্রভাবে তিনি কখনও বিবেকের সহিত আপস করিতে রাজী নহেন। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পুণা-চুক্তি লইয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে নানা বিতর্ক ও আলোচনা চলে। অহিংসা ও মানবসেবা গফর খানের জীবনের আদর্শ। তিনি স্পষ্টভাষায় এই চুক্তির বিরোধিতা করিয়া বলেন, "আমরা খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন করা। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা মানবসেবার জন্যও শপথ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য কেনই বা আমরা অন্য জাতির যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে যাইব? এই উপায়ে অর্জিত স্বাধীনতা একটি প্রহসন মাত্র এবং কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। আমরা যুদ্ধ ও যুদ্ধে অনুষ্ঠিত বর্বরতার নিন্দা করিয়া আসিতেছি। এখন আমাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করিবার সময় আসিয়াছে এবং যুদ্ধের

সহিত আমাদের জড়িত করিবার সমস্ত অপকৌশল ব্যাহত করিবার সময় সমুপস্থিত।" সীমান্তের অধিবাসিগণও গফর খানের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। ১৯৪০ সালের ৯ই আগস্ট এবোটাবাদে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এক অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গফর খানের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন হইতে থাকে এবং পুণা-চুক্তির কিছুদিন পরেই কংগ্রেসকে ফিরিয়া পুনরায় পুরাতন পথ অবলম্বন করিতে হয়। গফর খান্ পূর্বেই যাহা বুঝিয়াছিলেন, প্রকারান্তরে তাহারই সত্যতা প্রমাণিত হয়। গফর খান্ একবার যাহা আদর্শ ও কর্মপন্থার পরিপন্থী বলিয়া উপলব্ধি করেন তাহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করা মোটেই পছন্দ করেন না।

সংগ্রামের আহ্বান

ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিবার পর বাদশা খান্ খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সংগঠিত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। চরম সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঠানরা যাহাতে সেই সংগ্রামে যথাযথ অংশগ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য সংগঠন ও শক্তি সঞ্চয় করার জন্য সরদোয়াবে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তী দুই বৎসর তিনি গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। বাদশা খান্ গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে অহিংসা ও মুক্তির বাণী পৌঁছাইয়া দেন। বাদশা খানের মুখনিঃসৃত বাণী তাহাদের অন্তরে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সমস্ত ক্লীবতা দূর করিয়া বাদশা খান্ তাহাদের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করেন :—

"তোমরা বহুদিন যাবত 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক) এই ধ্বনি করিয়া আসিতেছ। এক্ষণে প্রকৃতই উহা

আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তোমরা পছন্দ কর আর না কর, উহার ফলাফল আমাদের উপর ছড়াইয়া পড়িবেই। ইংরাজ যে-কোন দিন এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কারণ অন্যান্য শক্তি অধিকতর বলশালী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং সর্বত্র তাহাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতেছে। তোমরা কি করিবে স্থির করিয়াছ? অপর কোন শক্তি আসিয়া এই দেশের উপর কর্তৃত্ব করুক তোমরা কি সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে চাহ? আমি খোদার নামে তোমাদের এই অনুরোধ করি যে, প্রত্যহ নূতন স্বামীর অনুসন্ধান-রত স্ত্রীলোকের মনোবৃত্তি বর্জন করিয়া পুরুষের ন্যায় আচরণের অনুশীলনে উদ্যোগী হও। পর-শাসন স্বীকার করিয়া লওয়া অপেক্ষা মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পর-হস্তক্ষেপ বা পর-আক্রমণ হইতে আমাদের স্বদেশ-ভূমিকে মুক্ত রাখিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিব। আমরা আর দাস-জীবন বরদাস্ত করিব না। এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়াও পাপ। যদি তোমরা শান্তি চাও, খোদাকে সন্তুষ্ট করিতে চাও, তাহা হইলে উঠ, জাগ, আর না হয় চিরতরে অধঃপতনের অতলতলে তলাইয়া যাও।" [ফ্রন্টিয়ার স্পীক্‌স্]

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

(ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব)

দ্বিতীয় মহাসমর বাধিবার পর মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে যখন ঘোষণা করা হইল যে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ করা হইতেছে, তখন সেই ঘোষণার সত্যতা যাচাই করিবার জন্য জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা দাবি করেন এবং ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের কি নীতি হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে জানাইতে অনুরোধ করেন।

পাকিস্তানের উদ্ভব

১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতশাসন-মূলক কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া নয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। ইহার কিছুকাল পূর্বে হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক আবতুল লতিফ ভারতবর্ষকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে ভাগ করিয়া একটি ভাবী শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। তিনি মুসলমানপ্রধান অংশের 'পাকিস্তান' নাম দেওয়ার প্রস্তাব করেন। মিঃ জিন্না অবিরত প্রচার করিতে থাকেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ মুসলমান জনসাধারণের উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং এইজন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া মুসলমানপ্রধান অংশকে সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দিতে হইবে। এই ব্যবস্থাটিকেই মোটামুটি তাঁহার অধীনস্থ মুসলিম লীগ পাকিস্তান বলিয়া প্রচার করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাকিস্তান কথাটির প্রবর্তক যে আবতুল লতিফ, তিনিও পরে লীগমার্কা পাকিস্তানের ব্যাপারে ঘোরতর বিরোধিতা করিয়াছেন। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, লীগ একমাত্র মুসলমান প্রতিষ্ঠান, আর পাকিস্তানের ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে হইবে, অগ্রে পাকিস্তান স্বীকার করিয়া না লইলে হিন্দুদের সহিত চরম আপসরফা হইতে পারে না—মিঃ জিন্না এই কথাই প্রচার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ভারতের অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী এবং ভারতের ভাগ্যকে ৪০ কোটি নরনারীর ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের সেরূপ একটি বিরাট অংশ এই পাকিস্তান প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। সীমান্ত-প্রদেশে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা এই পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। 'ইসলাম বিপন্নের' ধুয়া তুলিয়া ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করা হইলে যে বিষময় ফল দেখা দিবে, গফর খান্ বহুবার বহু বক্তৃতা, আলোচনা ও লেখার ভিতর দিয়া স্পষ্টভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলেন।

পাকিস্তান সম্পর্কে গফর খান্

একবার লুই ফিসার মিঃ জিন্নার পাকিস্তান ও পাকিস্তান-পন্থীদের সম্পর্কে গফর খানের মতামত জানিতে চাহিলে গফর খান্ স্পষ্টভাষায় পাকিস্তানপন্থীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বলেন, "ধনী খান্-গণ, ঐশ্বর্যশালী নবাবের দল ও প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারাই পাকিস্তান সমর্থন করেন। যাঁহারা আমার দরিদ্র কৃষক জনসাধারণের উপর নির্যাতন করেন, পাকিস্তান তাঁহাদেরই শক্তিবৃদ্ধি করিবে।" পাকিস্তান ইস্‌লামের শক্তি বৃদ্ধি করিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে গফর খান্ রাগিয়া বলেন, "জিন্না একজন নিকৃষ্ট মুসলমান। তিনি পয়গম্বরের প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুসরণকারী নহেন।"*

ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিবার চেষ্টা ও সামরিক নীতির পরিচালনায় ভারতের কর্তৃত্ব অস্বীকার করায় কংগ্রেস ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। মিঃ জিন্না ক্রিপ্‌স্-প্রস্তাবে পাকিস্তান সম্পর্কে কোনরূপ নিষ্পত্তি না দেখিয়া ক্রিপ্‌স্-প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। ভারতের কোন দল কর্তৃকই ক্রিপ্‌স্-প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না।

'ভারত ত্যাগ কর'

ভারতের আসল দাবি ব্রিটেন তথা মিত্রশক্তিবর্গ এইভাবে এড়াইয়া চলে এবং তাহার ফলে সমগ্র ভারতে নৈরাশ্য ও বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। এই সময় মহাত্মাজীর কণ্ঠে ভারতের মর্মবাণী ঘোষিত হয়। তিনি তাঁহার হরিজন পত্রিকায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারত ত্যাগ করিতে বলেন। মহাত্মাজীর সেই বাণী তখন সমগ্র

---

* হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ৭ই এপ্রিল ১৯৪৬, 'স্বাধীনতা ও ঐক্যবদ্ধ ভারত' —লুই ফিসার।

ভারতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে বিখ্যাত 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহাতে ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সামরিক শক্তির অপসারণ, সাময়িক গভর্নমেণ্ট গঠন, সম্মিলিত জাতিসমূহের সহিত পররাজ্য আক্রমণ প্রতিরোধের অভিপ্রায় এবং আবেদনের ব্যর্থতায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন আরম্ভের ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্ট মহাত্মা গান্ধী ও নেতৃস্থানীয় সমস্ত কংগ্রেস-কর্মীকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করিলেন। নেতৃবৃন্দের আকস্মিক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের জনগণের মধ্যে এক নিদারুণ বিক্ষোভের সূচনা হইল। গভর্নমেণ্ট কঠোরহস্তে আন্দোলন-দমনে উদ্যোগী হইলেন। স্বাধীনতার যজ্ঞবেদীতে বহু নরনারী আত্মোৎসর্গ করিল। এই সংগ্রামে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় নাই—এই আন্দোলন পরাধীন শৃঙ্খলিত জাতির মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

১৯৪২ সালের আগস্ট সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এখন পর্যন্ত রচিত হয় নাই। বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট ও নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও বক্তৃতার মারফত যখন যেটুকু জানা গিয়াছে সমস্ত একত্রিত করিলেও আন্দোলনের ব্যাপকতার তুলনায় তাহা নিতান্তই সামান্য হইবে। তাহা ছাড়া কংগ্রেস কমিটিগুলির পক্ষ হইতেও এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। সীমান্ত-প্রদেশের ১৯৪২ সালের খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নাই।

সীমান্তে আগস্ট আন্দোলন

আগস্ট আন্দোলনের প্রথম ভাগে সীমান্তের অধিবাসিগণ বাদশা খানের সুযোগ্য নেতৃত্ব পাইয়াছিল বলিয়াই আন্দোলন পরিচালনে সীমান্তের কংগ্রেস-কর্মিগণ প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ অহিংস ছিল। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে প্রথমতঃ পেশোয়ার জেলায় আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র প্রদেশে আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। প্রদেশের সর্বত্র বিপুলসংখ্যক সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া কংগ্রেস-কর্মিগণ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাবের আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে পাঠান জনসাধারণকে সমস্ত অহিংস শক্তি সংহত করিয়া চরম আত্মোৎসর্গের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে আহ্বান জানান।

১৯৩০ সালের আন্দোলনের ন্যায় ১৯৪৩ সালেও আন্দোলন পরিচালনে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা সম্পূর্ণ অহিংস থাকে। শত প্ররোচনামূলক অবস্থার মধ্যেও অহিংসার প্রতি তাহাদের অবিচলিত নিষ্ঠার সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করিয়া সীমান্ত-কর্তৃপক্ষ খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলন দমনে ২।১টি দৃষ্টান্ত ছাড়া কোন সময়েই বেপরোয়া হইয়া উঠিতে পারেন নাই। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মর্দান জেলায় আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠে। এই সময় ১১ই অক্টোবর পুলিসের গুলীতে ৩জন খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার নিহত হয় ও আরও কয়েকজন লোক আহত হয়। ইহা সত্ত্বেও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা সম্পূর্ণরূপে অহিংস থাকে। গফর খানের নিকট এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পৌঁছিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মর্দান জেলায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সীমান্ত-গভর্নমেণ্ট গফর খানের মর্দান জেলা প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিলেন। বাদশা খান্ তাঁহার সংকল্পে অটল। তিনি সীমান্ত-কর্তৃপক্ষের সেই

আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মর্দান জেলায় প্রবেশ করিলেন। সীমান্ত-কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে গফর খান্‌কে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হইল।

আগস্ট আন্দোলনের সময় যখন অন্যান্য প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনী ঘোষিত এবং ঐ সকল স্থানে সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছিল তখন একমাত্র সীমান্ত-প্রদেশেই কংগ্রেস নিয়মিত কাজ চালাইয়া যাইতেছিল; কারণ সে স্থানের অধিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে অহিংস ছিল। অহিংস-নীতিতে অবিচলিত থাকিবার জন্যই সীমান্ত-কর্তৃপক্ষ তাহাদের কার্যাবলী নিষিদ্ধ করিতে পারেন নাই।

আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে গফর খান্

১৯৪৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এক জনসভায় বক্তৃতাকালে খান্ আবদুল গফর খান্ ১৯৪২ সালে সীমান্তপ্রদেশে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অহিংসার প্রতি পাঠানদের অবিচলিত নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—১৯৪২ সালের আন্দোলনে ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশে সহিংস-উপায়াদি অবলম্বিত হইয়াছিল, তখন একমাত্র সীমান্ত-প্রদেশই সম্পূর্ণরূপে অহিংস ছিল। সে সময় যখন অন্যান্য প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, তখন একমাত্র সীমান্ত-প্রদেশেই কংগ্রেস নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া যাইতেছিল। কারণ সেখানে সকলেই সম্পূর্ণ অহিংস ছিল। তাহারা সকলে সেখানে অহিংসনীতিতে এরূপ অবিচলিত ছিল যে, সীমান্তের তদানীন্তন গভর্নমেণ্ট তাহাদের কার্যাবলী নিষিদ্ধ করিতে পারেন নাই। গভর্নমেণ্ট অবশ্য যে কোন

কারণেই হউক সীমান্ত-প্রদেশকে পাঞ্জাব হইতে বিভক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট সীমান্ত-প্রদেশের জনগণের অদম্য মুক্তি-স্পৃহা দমন করিতে পারেন নাই। কারণ তাহারা সকলেই অহিংস-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, 'অহিংস অস্ত্রটি' ভীরুদের জন্য নহে, বীরদের জন্যই, এবং সীমান্তপ্রদেশের অধিবাসিগণ ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে, তাহারা কৃতকার্যের সহিত গভর্নমেণ্টের দমনমূলক কার্যাবলীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে মর্দান জেলায় প্রবেশ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে গফর খান্ সীমান্ত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর বিভিন্ন কারাগারে বন্দী-জীবন অতিবাহিত করিবার পর ১৯৪৫ সালের ১৭ই মার্চ তিনি হরিপুরা জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন।*

গফর খানের মুক্তি-প্রসঙ্গ

'কুখ্যাত' আওরঙ্গজেব মন্ত্রিসভা

* বহু কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর সীমান্ত-প্রদেশে বহুকাল পর্যন্ত অন্য কোন দলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু গফর খানের গ্রেপ্তারের পর সীমান্ত-মন্ত্রিসভার প্রায় ১০ জন কংগ্রেসী সদস্যকে একে একে গ্রেপ্তারের ফলে পরিষদে মুসলিম লীগ দলের একপ্রকার কৃত্রিম সংখ্যাধিক্য হয়। সুযোগ বুঝিয়া সীমান্তের কংগ্রেস-প্রভাবকে বিলুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে সীমান্ত-গভর্নর লীগ দলের নেতা সর্দার আওরঙ্গজেব খান্‌কে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলেন। শীঘ্রই প্রতিক্রিয়াশীল লীগ দল এবং ব্রিটিশ সরকারের গোপন আলোচনা ফলপ্রসূ হইয়া উঠে এবং 'কুখ্যাত' আওরঙ্গজেব মন্ত্রিসভা সীমান্তে কায়েম হয়। ব্রিটিশ সরকারের ক্রীড়নকরূপে এই মন্ত্রিসভা মাসের পর মাস সীমান্তে যে অনাচার চালাইয়াছিলেন এবং মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা করিয়া পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ এবং জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে এই মন্ত্রিসভার

গফর খানের নূতন পরিকল্পনা

মুক্তিলাভের পর গফর খান উটামানজাই-এ স্বগৃহে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কারাগারে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দীর্ঘ কারানিপীড়নে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তথাপি জেল হইতে মুক্তিলাভের পরই কর্মের ডাকে তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বেশীদিন চুপচাপ বসিয়া থাকাও তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। গফর খান সীমান্তের সর্বত্র খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সংগঠন ও সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একটি নূতন পরিকল্পনা গঠন করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি জুন মাসের প্রথমার্ধে সীমান্ত-প্রদেশের সমস্ত জেলা পরিদর্শনের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করেন। দীর্ঘ কারাবাসে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে আরও কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু কর্মের আহ্বান উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব

প্রতি সীমান্তবাসীদের ক্ষোভ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৪ সালের শেষভাগে সীমান্ত-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ একে একে মুক্তিলাভ করিলে ডাঃ খান্ সাহেব প্রকাশ্য জনসভায় এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভাকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং সীমান্ত গভর্নরকে অবিলম্বে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে বলেন। গভর্নর নানা অছিলায় ডাঃ খান্ সাহেবের এবং সীমান্ত-জনগণের এই আবেদন উপেক্ষা করিয়া লীগ মন্ত্রি-সভাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কিছুকাল ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া অবশেষে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এইভাবে আওরঙ্গজেব মন্ত্রিসভার বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজয় হয় এবং ডাঃ খান্ সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত-প্রদেশে পুনরায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সময়ই ডাঃ খান্ সাহেব জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করেন যে, তিনি অবিলম্বে তাহাদের অবিসংবাদী নেতা গফর খান্‌কে মুক্তি দিবেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গফর খান্ মুক্তিলাভ করেন।

হইয়া উঠে। ডাক্তারের পরামর্শ ও আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের অনুরোধও তাঁহাকে গৃহে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না।

তাঁহার কর্মপ্রণালী

গফর খান্ জুন মাসের মাঝামাঝি সফরে বাহির হন। চার্সাদ্দাতে সারধারী গ্রামে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের এক বিরাট সভায় গফর খান্ তাঁহার গঠনমূলক পরিকল্পনা ও সফরের উদ্দেশ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি সীমান্তের সর্বত্র খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের গঠনমূলক কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। পল্লীশিক্ষা-কেন্দ্রগুলির আবার একটি জেলা-সদর-কেন্দ্র থাকিবে এবং পল্লীকেন্দ্রগুলিকে এই সদর-কেন্দ্রের নির্দেশ ও পরামর্শ মানিয়া চলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাদশা খান্ সরদোয়াবে প্রাদেশিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। পল্লীশিক্ষাকেন্দ্রে গঠনমূলক কার্যাবলীর প্রাথমিক পদ্ধতিসমূহ আয়ত্ত করিবার পর চূড়ান্ত শিক্ষাগ্রহণের জন্য কর্মিগণকে প্রাদেশিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাদেশিক শিক্ষাকেন্দ্রে ত্যাগ ও সেবাব্রতী নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে তাহাদের ত্যাগ, পরমত-সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, সেবা ও সর্বোপরি শৃঙ্খলারক্ষার অনুশীলনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হইবে।

পল্লী-অঞ্চল সফরে বাধা—গফর খানের গ্রেপ্তার-প্রসঙ্গ

সীমান্তের পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার এই পরিকল্পনা জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি সফরে বাহির হন। বাদশা খান্ ঘরে ঘরে তাঁহার 'সেবার মহৎ বাণী' প্রচার করিতে থাকেন। কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিবার পর জুলাই মাসের শেষদিকে

হাজরা জেলা যাইবার পথে আটক ব্রীজের নিকট পুলিস তাঁহাকে আটক করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে আটক জেলায় প্রবেশ ও জনসভায় বক্তৃতা নিষিদ্ধ করিয়া আটকের ডেপুটি কমিশনার গফর খানের উপর এক আদেশ জারী করেন। প্রস্তাবিত কর্মসূচী অনুযায়ী গফর খানের পাঞ্জাবের আটক জেলার চাচা অঞ্চলে দুইদিন থাকিবার কথা ছিল। গফর খান্ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে এক পত্র দেন যে, তাঁহার জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কোন ইচ্ছা নাই। তবে হাজরা জেলা যাইবার পথে ঐ অঞ্চল দিয়া তিনি যাইতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের সহিত কেবলমাত্র সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন।

চীফ্ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী খান্ আমীর মহম্মদ খান্ ও সীমান্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি খান্ আলিগুল খান্ও গফর খানের সহিত হাজরা জেলা অভিমুখে যাইতেছিলেন। আটক ব্রীজের নিকট পুলিস তাঁহাদের বাধা দিলে গফর খান্ গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে পাঞ্জাব-এলাকায় প্রবেশ করেন। গফর খান্ পুলিসকে বলেন যে, তাঁহাকে যখন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তখন তাঁহাকে হাজতে লইয়া যাওয়া হউক। ইহাতে পুলিস তাঁহাকে জানায় যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তিনি এবোটাবাদে যাইতে পারেন অথবা পেশোয়ারে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু গফর খান্ পুলিসের কোন প্রস্তাবেই রাজী হন না।

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ

বাদশা খানের গ্রেপ্তারের সংবাদে খোদাই-খিদ্মদ্গারদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে দলে দলে খোদাই-খিদ্মদ্গার আটক ব্রীজের অভিমুখে যাত্রা করে। কংগ্রেসের উদ্যোগে পেশোয়ারে খোদাই-খিদ্মদ্গারদের এক সভায় গফর খান্কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাঞ্জাব সরকারের কার্যের তীব্র নিন্দা

করা হয়। কি অবস্থায় গফর খান্‌কে গ্রেপ্তার করা হয়, খান্‌ আলিগুল খান্‌ সভায় তাহা বর্ণনা করেন। সভায় সমবেত জনমণ্ডলী দৃঢ়তার সহিত জানায় যে, সীমান্তের অধিবাসিগণ বাদশা খানের পশ্চাতে রহিয়াছে এবং বাদশা খানের জন্য তাহারা যে কোন সময়ে যে কোন প্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত আছে।

পরে পাঞ্জাব পুলিস গফর খান্‌কে ক্যাম্বেলপুরে লইয়া যায় এবং অতঃপর তাঁহাকে সীমান্ত-প্রদেশের কোহাট জেলার খুসাবগর নামক স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয়। পাঞ্জাব সরকার নাকি গফর খানের গ্রেপ্তারের সম্পর্কে কোন আদেশ জারী করেন নাই। এমন কি তাঁহার গ্রেপ্তার অথবা পরে তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে সরকারী সূত্রে কোন সংবাদ পাওয়ার কথাও পাঞ্জাব সরকার সরাসরি অস্বীকার করেন। ২৭শে জুলাই গফর খান্‌ এবোটাবাদে পৌঁছেন।

লালা ভীমসেন সাচারের প্রতিবাদ

গফর খানের প্রতি সরকারের অযৌক্তিক মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়া পাঞ্জাব পরিষদের কংগ্রেসদলের নেতা লালা ভীমসেন সাচার এক বিবৃতির মারফত বলেন যে, স্বাধীনতার জন্য পাঞ্জাবের অগ্রগতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। লালা সাচার এই নিষেধাজ্ঞাকে মূর্খতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের পরিচয় বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই আদেশের জন্য যদি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী হন, উহার দ্বারা জেলার কর্তৃত্ব গ্রহণের মত উচ্চপদের যোগ্যতা যে তাঁহার নাই তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। বাদশা খান্‌ শান্তি ও শুভেচ্ছারই অগ্রদূত। তাঁহার প্রতি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ক্ষমারও অযোগ্য। এই আদেশ দ্বারা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেন্টের প্রতিও অন্যায় করিয়াছেন। আর যদি

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেণ্টকে জানাইয়া এই কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের নিন্দা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

পাঞ্জাব-পুলিসের আপত্তিকর ব্যবহার

গফর খান্ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে তাঁহার গ্রেপ্তার ও মুক্তির কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে আটকের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তজ্জন্য তিনি আটকের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দায়ী করিতেছেন। তিনি বলেন যে, পাঞ্জাব সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাঁহার উপর ম্যাজিস্ট্রেট যে নোটিশ জারী করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরেই তিনি ঐকথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছিলেন, তবে তাঁহার উপর যদি এরূপ কোন আদেশ জারী করা হয়, যাহার ফলে বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে তিনি সে আদেশ পালন করিতে পারেন না, কারণ উহা দ্বারা শান্তিপূর্ণ নাগরিকের সাধারণ অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইবে। পাঞ্জাব-পুলিস তাঁহার প্রতি আপত্তিকর ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া গফর খান্ অভিযোগ করেন।

কাশ্মীরে গফর খান্

৩রা আগস্ট গফর খান্ শ্রীনগর গমন করেন। সেখানে পণ্ডিত জওহরলালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের মুক্তিলাভের পর গফর খান্ ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ। সীমান্তের তদানীন্তন পরিস্থিতি লইয়া নেতৃদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়! সেইদিনই কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য গফর খান্ রওনা হইয়া যান।

বিশ্রাম গ্রহণ

এই সময় চিকিৎসকগণ গফর খানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দেন। ইহার পর গফর খান্ রমজানের ৩০ দিন ভজাগলির নির্জন পার্বত্য প্রদেশে উপবাস, প্রার্থনায় ও আত্মচরিত রচনায় অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাহারও সহিত দেখা করিতেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি পত্রের সাহায্যে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের পরামর্শ দিতেন।

বাঙ্গালাদেশে গফর খান্ঃ
ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে যোগদানের জন্য গফর খান্ কলিকাতা আগমন করেন। তিনি ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা পৌছেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকসমূহে যোগদানের পর ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করেন। ৭ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদের বাসভবনে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশন ৫ দিন ধরিয়া চলে। অধিবেশনকালে সর্বসমেত ৯টি বৈঠক হয়; তন্মধ্যে ৭টি আজাদ ভবনে এবং দুটি সোদপুরে গান্ধীজীর কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। গফর খান্ ২টি বৈঠক ছাড়া আর সমস্ত বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। গফর খান্ প্রায়ই সোদপুরে গান্ধীজীর সহিত সান্ধ্য-প্রার্থনায় যোগদান করিতেন। গান্ধীজীর পার্শ্বে উপবিষ্ট সীমান্ত-গান্ধীকে একজন অতিকায় মানব বলিয়া মনে হয়। দাঁড়াইলে মহাত্মা গান্ধী গফর খানের স্কন্ধদেশ পর্যন্ত পৌছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের মিলন অন্তরে।

গফর খান্ সভায় যাওয়া বা বক্তৃতা করা কোনটাই পছন্দ করেন না। তাঁহার বাণী কর্মের বাণী, সেবার বাণী। ১০ দিন কলিকাতা থাকাকালে গফর খান্ মাত্র একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত নেহরুর সহিত আর একদিন ছাত্রদের বিশেষ অনুরোধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে একটি ছাত্রসভায় যোগদান করেন। ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় একটি জনসভায় বক্তৃতাকালে ইহার কারণ বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শহরের লোকেরা সাধারণতঃ রেডিও ও সংবাদপত্রাদির মারফত রাজনৈতিক মতবাদ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায় এবং তাহাদের একটা-না-একটা রাজনৈতিক মতবাদে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞ অগণিত পল্লী নরনারী এই সুযোগলাভ হইতে বঞ্চিত। বিশ্বের রাজনৈতিক মতবাদসমূহের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অত্যন্ত সরলপ্রকৃতির হইয়া থাকে। এইজন্যই তিনি সেই সরল গ্রামবাসীদের নিকট তাঁহার বক্তব্য বলা বেশী পছন্দ করেন।

বাঙ্গালার উদ্দেশ্যে গফর খানের বাণী

বাঙ্গালা ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে বাঙ্গালার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট একটি বাণী চাহিলে গফর খান্ বিনয়ের সহিত বলেন যে, তিনি তো একজন অসামান্য নেতা নহেন। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষেরই একজন। তাঁহার কি বাণী দেওয়ার মত যোগ্যতা আছে? তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গালা যদি তাঁহার নিকট বাণী চাহে, তবে তিনি বাঙ্গালার অধিবাসিগণের জন্য 'সেবার বাণীই' রাখিয়া যাইবেন। অতঃপর গফর খান্ বলেন—"আমি খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। এই দেশের যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গ্রামের মানুষ আছে তাহাদের মধ্যে গিয়া কাজ করা, তাহাদের সেবা করাতেই আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি দরিদ্র, পদদলিত, দুর্বল ও অস্পৃশ্যদের সেবা করিতে,

মানুষের সেবা করিতেই আমি খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের শিখাইয়াছি। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবার মধ্যেই আমি স্বাধীনতার আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালার অধিবাসিগণের নিকটে আমার সেবার বাণীই আমি রাখিয়া যাইতেছি। যদি বাঙ্গালাদেশ আমার নিকট হইতে বাণী চাহে, তবে তাহাকে এই বাণী দিয়া যাইতেছি,—আমার দরিদ্রসেবার ব্রতই সে গ্রহণ করুক এবং গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রয়োজনীয় কার্যাদি সাধন করুক।”......

“আমরা ব্রিটিশদের অপেক্ষা উন্নততর না হইতে পারিলে স্বাধীনতালাভ করিতে পারিব না। যতদিন তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া থাকিব ততদিন আমাদের পক্ষে স্বাধীনতার দাবি করা উচিত নহে। ব্রিটিশদের অপেক্ষা আমাদের উন্নত হইতে হইলে চরিত্রের দিক দিয়া আমাদের খাঁটি হইতে হইবে। কেবলমাত্র প্রার্থনায় যোগদান অথবা নেতৃবৃন্দের সম্মুখে মাথা নত করিলেই আমাদের প্রকৃত চরিত্রলাভ হইবে না। এই চরিত্রলাভ কাহাকেও শিখানো যায় না। মানুষের কাজের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ। আমাদের স্বার্থান্বেষণ, অর্থলোভ, নিজ সহোদরদের সহিত বিরোধ জগতের নিকট আমাদের হেয় করিয়া তুলিয়াছে।”

সাম্প্রদায়িক বিরোধে দুঃখপ্রকাশ করিয়া গফর খান্ বলেন, “একই মাটিতে লালিত-পালিত দুই সন্তান হিন্দু-মুসলমান পাশা-পাশি বাস করিতেছে। পৃথিবীর আর কোথাও কি আপনারা শুনিয়াছেন, ‘হিন্দু জল,’ ‘মুসলমান জল’ বলিয়া লোকে চেঁচাইতেছে। যতদিন পর্যন্ত না এই বালাই শেষ হয়, ততদিন আমরা ‘মানুষ’ নামেরও অযোগ্য।

“একবার একজন ব্রিটিশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। কোনদিনই সে কর্তব্য হইতে বিচলিত হইবে না। অর্থলোভ তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না ; মৃত্যুতেও সে পরাজয় স্বীকার করে না। পরমাণু বোমার মত ভয়ঙ্কর বস্তুও তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে

না। কিন্তু ভারতের এমন অনেকের দেখা মিলিবে, যাহারা পরস্পরকে বঞ্চনা করিতেছে। আমাদের বহুলোকের মধ্যে অপকটতা নাই।

“কংগ্রেস এতদিন ধরিয়া উদ্দেশ্যলাভ ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জাতির মুক্তির জন্য গান্ধীজী তাঁহার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সকলের মধ্যে প্রকৃত ও অপকট ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে কিছুই লাভ হইবে না।

“আমি গ্রামে গ্রামে গিয়া গ্রামের মানুষের মধ্যে কাজ করিতে ভালবাসি। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের জন্যই আমি বাঙ্গালায় আসিয়াছি। বাঙ্গালার গ্রামগুলিতে যাইতে পারিতেছি না। আমার এই গ্রামগুলিতে ঘুরিবার বড় ইচ্ছা, কিন্তু হাতে সময় নাই।”

সীমান্ত-প্রাদেশিক নির্বাচন

গফর খান্ ১৯৪৬ সালের জানুআরি মাসে বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর প্রাদেশিক নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সীমান্ত-প্রদেশে নির্বাচনে সরকারী কর্মচারিগণ ও লীগ-সমর্থকেরা প্রকাশ্যে যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন, গফর খান্ সর্বত্র তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফেব্রুআরি মাসের প্রথম দিকে গফর খান্ নির্বাচনী প্রচারকার্যের জন্য প্রদেশ-সফরে বাহির হন এবং প্রদেশ পরিভ্রমণকালে মুসলিম লীগ ও সরকার পক্ষের দুর্নীতি ও অপকৌশল সম্পর্কে জনসাধারণের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে বলেন।

খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারগণ যাহাতে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য সরকারপক্ষ সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হয়। গফর খান্ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারকার্যের দ্বারা কংগ্রেসকে দুর্বল করাই সরকার পক্ষের উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তী

কতকগুলি ঘটনা হইতে তাহার মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তলে তলে একটা উদ্দেশ্যমূলক ও সুসংবদ্ধ ষড়যন্ত্র চালান হইয়াছে। গফর খান্ ২৫শে ফেব্রুআরি সীমান্ত-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের এক সভায় স্পষ্ট ভাষায় ইহা ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গফর খান্ সরকার পক্ষের এই ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "প্রদেশ-সফর শেষ করিয়া ফিরিবার পর সরকারী শাসনযন্ত্র কিভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কাজ চালাইয়া যাইতেছে সে সম্পর্কে আমি মন্ত্রিমণ্ডলীকে জানাইয়াছিলাম। গোড়ার দিকে আমার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, ইহা হয়ত কেবলমাত্র কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারকার্য; কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের বিরুদ্ধে একটা সুসংবদ্ধ ষড়যন্ত্র চালান হইয়াছে।"

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল, সরকার পক্ষের সমস্ত অপকৌশল সত্ত্বেও সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে। সীমান্ত-পরিষদে মোট ৫০টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনেই কংগ্রেস-প্রার্থীগণ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ প্রার্থীরা মাত্র ১৭টি আসন পায়। অন্যান্য দলের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমান ২টি ও অকালীদল ১টি আসন লাভ করে।

নির্বাচনের পর যখন দেখা গেল সীমান্ত-ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, তখন সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে পরামর্শের জন্য কংগ্রেসের তরফ হইতে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সীমান্ত-প্রদেশে গমন করেন। ফেব্রুআরি মাসের শেষ সপ্তাহে মৌলানা আজাদ পেশোয়ারে পৌছেন। সেখানে খান্ আবদুল গফর খান্ ও ডাঃ খান্ সাহেবের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনার পর তিনি সীমান্তে কংগ্রেসী

মন্ত্রিসভা গঠনের পরামর্শ দেন। সীমান্ত-প্রদেশে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মৌলানা আজাদ সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী নেতৃগণকে মন্ত্রিসভা গঠনে পরামর্শ দেন। অতঃপর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডাঃ খান্ সাহেবের নেতৃত্বে সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৯৪২ সালে স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারত-শাসনমূলক প্রস্তাব লইয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার ঠিক ৪ বৎসর পর ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনুমোদনক্রমে এবং পার্লামেণ্টের অনুরোধে ভারতের সহিত একটা বোঝাপড়া ও ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের অভিপ্রায় লইয়া ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ করাচীতে পদার্পণ করেন। ক্রিপ্‌স্ সাহেবও গতবার ১৯৪২ সালের ঠিক ২৩শে মার্চেই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিমিশন ভারতে আসিয়াই কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দকে আলাপ-আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করেন। দিল্লীতে নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রিমিশনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। লীগ-দলপতি মিঃ জিন্নার একগুঁয়েমির জন্য আপস-আলোচনা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি পাকিস্তানের দাবি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন না। একটিমাত্র যুক্তরাষ্ট্র বা একটিমাত্র শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাবে মিঃ জিন্না কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তিনি ভারতবর্ষকে সার্বভৌম দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার দাবি জানাইলেন—একটি হিন্দুস্থান এবং অপরটি পাকিস্তান। অপর পক্ষে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা, অখণ্ড ভারত ও স্বয়ং-শাসিত প্রদেশ-গুলির সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দাবি জানাইলেন।

অতঃপর মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপোস-আলোচনা চালাইবার জন্য ৬ই মে সিমলায় ত্রিদলীয় বৈঠক আরম্ভ হইল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ, খান্ আবদুল গফর

খান্, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে সমসংখ্যক প্রতিনিধি ও মন্ত্রীমিশনের মধ্যে যুক্ত বৈঠক বসিল। কিন্তু সপ্তাহকাল অধিবেশনের পর সিমলা-সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। লীগ সমস্ত ব্যাপারটি মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক সালিসের প্রস্তাবেও রাজী হইল না।

সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার ৪ দিন পর ১৬ই মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুগপৎ বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী এবং ভারতে বড়লাট ও মন্ত্রিমিশন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ৬টি মূল প্রস্তাব সহ এক নয়া পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

দেশী ও বিদেশী প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মন্ত্রিমিশনের সুপারিশ বর্তমান অবস্থায় এক-কথায় "গ্রহণযোগ্য" বলিয়া মত প্রকার করে। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার হরিজন পত্রিকায় মন্ত্রিমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে বলিলেন, "বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর কোন দলিল রচনা করিতে পারিতেন না।" অবশ্য, পরে তিনি এই দলিলে যে গুরুতর দোষত্রুটি আছে তৎপ্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

মন্ত্রিমিশনের সুপারিশ যেভাবে গ্রুপ (মণ্ডল) ভাগের প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহাতে কংগ্রেসমহলে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। সীমান্ত-প্রদেশ ও আসামকে যেভাবে এক-একটি মণ্ডলে জুড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে সেরূপ করা হইলে এই দুইটি প্রদেশের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করা হইবে। আসামের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বরদুলুই ও সীমান্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান্ সাহেব ও গফর খান্ এই বাধ্যতামূলক মণ্ডলভাগের তীব্র বিরোধিতা করিলেন। কিন্তু কোন্ প্রদেশ কোন্ মণ্ডলে যোগ দিতে চাহে কি না চাহে তাহা না দেখিয়া কতকগুলি প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগ দেওয়ার জন্য বাধ্য করিতে মুসলিম লীগ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

খান্ আবদুল গফর খান্ ২২শে মে নয়া দিল্লী হইতে এ সম্পর্কে লীগের মনোভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলিলেন, "মুসলিম লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের উপর জোর দিয়াছিলেন। কংগ্রেসকে দিয়া উহা স্বীকার করাইয়া লইতে বহুলোক আমার উপর চাপ দিয়াছিলেন। কংগ্রেস পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং এমন কি আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্ত দাবিই স্বীকার করিয়াছে। এক্ষণে কোন্ প্রদেশ কোন্ মণ্ডলে যোগ দিতে চাহে কি না চাহে, তাহা না দেখিয়াই কতকগুলি প্রদেশকে প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগ দেওয়ার জন্য বাধ্য করিতে মুসলিম লীগ জিদ ধরিয়াছে। ইহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে অস্বীকার করা হইতেছে। প্রদেশসমূহ অবশ্যই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে, কিন্তু প্রদেশসমূহকে স্বাধীনভাবে ও শুভেচ্ছার মনোভাব লইয়াই তাহা করিতে হইবে।"

ভারতের স্বাধীনতা ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি একজন খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার। মানবতার সেবাকেই আমি খোদার সেবা বলিয়া মনে করি। আমি ইসলামের কাছ হইতে সকল মানবের সেবা করিবার শিক্ষাই পাইয়াছি। স্বাধীনতার অভাবে ধর্ম কিংবা অন্য কল্যাণকর কিছুই করা যায় না। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং ইহার অর্থ—এই মহান্ দেশে যাহারা বাস করে তাহাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করা। আমার মনে হয়, সম্প্রদায়ের প্রীতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই ভারতের স্বাধীনতা বিকাশ লাভ করিতে পারে। আমি এই উদ্দেশ্য লইয়াই কাজ করিতেছি এবং এইভাবে কাজ করিয়া যাইব। ঘৃণা ও বিদ্বেষের পথে ভারত অথবা ভারতের কোন সম্প্রদায় বিকাশ লাভ করিতে পারিবে না। আমাদের সকলকে একসঙ্গে বাস করিতে হইবে এবং একসঙ্গে চলিতে হইবে।"

মুসলমান-সমাজের নিকট তাহাদের মহান্ ধর্মের নির্দেশ মানিয়া চলিবার জন্য আবেদন জানাইয়া বাদশা খান্ আরও বলিলেন, "আমি আশা করি, সময় আসিতেছে যখন আমরা সকলেই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমগ্রভাবে স্বাধীনতার চিত্রপটে দৃষ্টিপাত করিব। আমরা ব্যর্থ সংঘর্ষে প্রচুর সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছি। ইহাতে আমাদের শত্রুই লাভবান হইয়াছে। মুসলমানদের কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে। আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মহান্ ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে অনুরোধ করিতেছি এবং এই দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা ও বিকাশ লাভের জন্য অপরাপর সকলের নেতৃত্ব আহ্বান করিতেছি।"

মে মাসের শেষ সপ্তাহে গফর খান্ পেশোয়ারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ২৭শে মে কোহাটে সীমান্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের এক সভায় গফর খান্ দিল্লীর শাসনতান্ত্রিক আলোচনা ও মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিলেন। এই সম্মেলনে মন্ত্রিমিশনের সুপারিশে প্রদেশ-সমূহকে প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানে বাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

জুন মাসের প্রথমে গফর খান্ মন্ত্রিমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে জনমত জানিবার জন্য প্রদেশ-সফরে বাহির হইলেন। সফরের সময় খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সহিত আলাপ-আলোচনায় গফর খান্ দেখিলেন যে, সকলেই বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে। তিনি এই সফর হইতে ফিরিবার পর সংবাদপত্রে এক বিবৃতি মারফত তাঁহার সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলিলেন যে, "সীমান্ত-প্রদেশে পুশ্‌তো ভাষাভাষী সমস্ত লোকই বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানের বিরুদ্ধে। সীমান্তের পাঠানগণ স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং তাহাদের ক্ষুণ্ণ করে এরূপ কোন প্রস্তাবেই পাঠানগণ কখনও সম্মতি দিতে পারে না।"

অন্তর্বর্তী সরকার ও গণ-পরিষদ্

মন্ত্রিমিশন যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তাহাতে এমন কতকগুলি ধারা ছিল, যাহার অর্থ বিভিন্নরূপ হইতে পারে। ইহাতে গণ-পরিষদ্ গঠনের কথা বলা হইয়াছিল এবং এই গণ-পরিষদের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ভার ছিল। তাই কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গণ-পরিষদে ও অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। গোড়ার দিকে মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে পাকিস্তানের বীজ নিহিত আছে দেখিয়া ঐ প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন লইয়া বিরোধ বাধিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ১৪ জন সদস্য থাকিবে। ঐ ১৪ জনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য হইবে ৬ জন, মুসলিম লীগের থাকিবে ৫ জন, এবং একজন শিখ, একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান ও একজন পার্শী। কিন্তু মুসলিম লীগ দাবী করিল যে, কংগ্রেস তাহার অংশ হইতে কোনও জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। কংগ্রেস উহাতে সম্মত হইল না। ফলে তাহারা গণ-পরিষদে যোগদান করিতে সম্মত হইলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে চাহিল না। মুসলিম লীগ মনে করিল, কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যখন যোগ দিতেছে না, তখন ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। তাহারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে রাজী হইল, কিন্তু গণ-পরিষদে যোগ দিতে চাহিল না। কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ না দেওয়ায় মন্ত্রিমিশন মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী হওয়া সত্ত্বেও তাহা করিতে দেওয়া উচিত মনে করিলেন না। তাঁহারা ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন।

মুসলিম লীগ ইহাকে মন্ত্রিমিশনের বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দিল বং তাহারা মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ প্রত্যাহার করিয়া পাকিস্তান

আদায়ের জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' কথা ঘোষণা করিল। ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) তাহারা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবস' ঘোষণা করিল। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যে কাহার বিরুদ্ধে হইবে, তাহা তখনও জানা গেল না।

৮ই আগস্ট কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করিল এবং গণ-পরিষদ্ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে সম্মত হইল। কংগ্রেসের নূতন সভাপতি জওহরলাল নেহরু মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সকল দলের কাছে মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গণপরিষদে ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে আহ্বান জানাইলেন। ১২ই আগস্ট বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরুকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে ডাকিলেন। মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য তিনি মুসলিম লীগকেও আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু জিন্না ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। ১৫ই আগস্ট জওহরলাল নিজে জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারে যোগ দিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু জিন্না কোনমতে সম্মত হইলেন না।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—রক্তের বন্যা

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কি, তাহা ১৬ই আগস্ট সারা দুনিয়া বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিল। সংগ্রামের নামে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন, নারী-অপহরণ প্রভৃতি ছিল ইহার কর্মসূচী। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা প্রদেশ সরকার চালাইতেছিল। ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যায় ময়দানে এক সশস্ত্র মুসলিম জনতা সমবেত হইল এবং সভাশেষে তাহারা "আল্লা হো আকবর," "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড, দোকান, ঘরবাড়ি লুটপাট শুরু করিল। মুসলিম লীগ সরকার তাহা কেবল

নীরবে প্রত্যক্ষ করিল না, দাঙ্গায় উসকানি দিল, সাহায্যও করিল। অতর্কিত আক্রমণে বহু হিন্দু নিহত হইল। কিন্তু কলিকাতার হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইল এবং পাল্টা আক্রমণ চালাইল। তাহাতে অসংখ্য মুসলমান নিহত ও মুসলমানদের দোকানপাট লুণ্ঠিত হইল, বহু মুসলিম বস্তি এবং ঘরবাড়ি জ্বালানো হইল। মুসলমানরা এখন মার খাইতেছে দেখিয়া সরকার বাধ্য হইয়া সামরিক বাহিনী ডাকিল ও দাঙ্গারোধে অগ্রসর হইল।

২রা সেপ্টেম্বর জওহরলালের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। মুসলিম লীগের জন্য নির্ধারিত আসনগুলি শূন্য রহিল। জওহরলাল নেহরু জিন্নার সহিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের বিষয়ে আলোচনা চালাইতে রাজী হইলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোস-আলোচনা চলিল। কিন্তু মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহিত মীমাংসায় না আসিয়া বড়লাটের কাছে কয়েকটি শর্ত দিল। এই শর্তগুলি কংগ্রেসও মানিয়া লইতে পারিত। কিন্তু মুসলিম লীগ সে পথে গেল না। বড়লাট শর্তগুলি মানিয়া লইতেই মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে রাজী হইল। মুসলিম লীগের অন্যতম মনোনীত মন্ত্রী গজনফর আলি খান্ লাহোরের একটি জনসভায় ঘোষণা করিলেন, তাঁহারা পাকিস্তানের জন্য লড়াইকে তীব্রতর করিবার জন্যই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতেছেন। মুসলিম লীগ যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজে ব্যাঘাত-সৃষ্টির জন্যই ঢুকিতেছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

আবদুল গফর খান্ গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন ডেপুটি লীডার আবদুল কোয়াইয়ুম খান্ মুসলিম লীগে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সীমান্ত প্রদেশে প্রাধান্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তখনও মুসলিম লীগ যোগ

না দেওয়ায় উহাকে মুসলিম লীগ "হিন্দুরাজ" বলিয়া বর্ণনা করিতেছিল। জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পূর্বে ভারত সরকার ওয়াজিরিস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছিল এবং আবদুল গফর খান্ ও জওহরলাল নেহরুর চেষ্টাতেই এই বোমা-বর্ষণ বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রচার করিতে লাগিল যে, নেহরুর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই ওয়াজিরিস্থানের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হইলেও সীমান্তের পলিটিক্যাল এজেণ্টরা আবদুল গফর বা খোদাই-খিদমতগারদের উপজাতীয় এলাকায় প্রবেশ করিতে দিল না। অথচ তাহারা মুসলিম লীগ-কর্মীদের উপজাতীয় এলাকায় প্রবেশ ও প্রচারে সাহায্য করিতে লাগিল।

জওহরলাল নিজে সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা দেখিবার জন্য সীমান্ত প্রদেশে যাইতে চাহিলেন। তিনি যাহাতে উপজাতীয় এলাকায় না যান, সেজন্য স্বয়ং বড়লাট ও সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জওহরলালকে বিরত করা গেল না। ১৬ই অক্টোবর তিনি বিমানযোগে পেশোয়ারে পৌঁছিলেন এবং আবদুল গফর খান্ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান্ সাহেবের ভবনে লইয়া গেলেন। প্রায় পাঁচ হাজার মুসলিম লীগপন্থী বর্শা-বল্লম লাঠিসোটা লইয়া নেহরুজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। আবদুল কোয়াইয়ুম খান্ এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব করিলেন। বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারীরা নেহরুর গাড়িতে চড়াও হইল। শেষ পর্যন্ত ডাঃ খান্ সাহেব নিজে রিভলভার বাহির করিয়া আক্রমণকারীদের ছত্রভঙ্গ করিলেন।

জওহরলাল উপজাতীয় অঞ্চল সফরে গেলেন। আবদুল গফর খান্ ও ডাঃ খান্ সাহেব তাঁহার সঙ্গে গেলেন। ডাঃ খান্ সাহেব সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী হইলেও তাঁহার পক্ষেও উপজাতীয় অঞ্চলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহারা বিমান-যোগে মিরনসাহ পৌঁছিলে

ইংরেজ সরকার ও মুসলিম লীগ দলের প্ররোচনায় কিছুসংখ্যক উপজাতীয় তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। নেহরু উপজাতীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সফর করিলেন এবং ইংরেজ সরকার ও মুসলিম লীগের অপপ্রচারগুলির জবাব দিলেন। ২১শে অক্টোবর খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের সদর কার্যালয় সরদরিয়াবে নেহরু এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিলেন। ২৩শে অক্টোবর নেহরুজী দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ যে পৈশাচিক পথ অবলম্বন করিয়াছিল, সেই পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। কলিকাতায় শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই মার খাইয়াছিল। তাই তাহারা পূর্ববঙ্গে নোয়াখালিতে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৮৫ জন, সেখানেই হিন্দুনিধনের পরিকল্পনা করিল এবং হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি পৈশাচিক কাণ্ড শুরু করিল। হাজার হাজার শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে ও বিহারে আশ্রয় লইল। বিহারের হিন্দুরা নোয়াখালির প্রতিশোধ লইল। বিহারে হাজার হাজার মুসলমান নিহত ও গৃহচ্যুত হইল। বিহারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইল যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ। হাজারা জেলায় মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদের হত্যা করিল।

যখন সারা ভারতে এই সাম্প্রদায়িকতা-দানবের তাণ্ডব চলিতেছিল, তখন মুসলিম লীগও অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়াছিল। গান্ধীজী শান্তিস্থাপনের জন্য নোয়াখালিতে গিয়াছিলেন। তিনি বিহারের মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া বিহারে চলিয়া আসিলেন। আবহুল গফর ইতিমধ্যে বিহারে আসিয়া বিহারের মুসলিম অঞ্চলগুলিতে সফর করিতেছিলেন। গান্ধীজী পাটনা আসিলে তিনি তাঁহার সহিত যোগ দিলেন এবং উভয়ে বিহারে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

আবতুল গফর বলিলেন, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছেন, কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নাই।

ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে কোনও মুসলমান যাহাতে যোগ না দেয়, সেজন্য ফতোয়া দিল। কংগ্রেস মুসলিম লীগকে বাদ দিয়াই গণ-পরিষদের কাজ চালাইয়া যাইতে সংকল্প করিল এবং ভবিষ্যৎ ভারতীয় সংবিধানের মূল লক্ষ্য কি তাহা ঘোষণা করিল।

ভারতবিভাগ ও স্বাধীনতালাভ

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বেই বৃটিশ সরকার ভারতীয়গণের হস্তে ভারতের শাসনভার হস্তান্তরিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। তিনি সেই সঙ্গে ইহাই বলিলেন যে, মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল কোন গণ-পরিষদ্ যদি ইতিমধ্যে ভারতের সংবিধান রচনা করিতে না পারে, তবে বৃটিশ সরকার নির্দিষ্ট দিনে বৃটিশ ভারতের শাসনভার কোনও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে বা প্রয়োজন হইলে কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের হস্তে তুলিয়া দিবেন। সেই সঙ্গে তিনি বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কার্যকালের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের নূতন বড়লাট নিযুক্ত করিলেন।

মার্চ মাসের গোড়ার দিকে রাওলপিণ্ডিতে কয়েকদিন বাদেই পেশোয়ারেও দাঙ্গা বাধিল। মুসলিম লীগপন্থীরা গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও শিখদিগকে ইসলাম ধর্ম-গ্রহণে বাধ্য করিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া ওঠায় হিন্দু ও শিখরা ভয় পাইল। প্রায় দশদিন কেহ ঘরের বাহিরে আসিল না, দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল

অবশেষে প্রায় দশহাজার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার পেশোয়ারে পৌঁছিয়া শহরে শান্তি স্থাপন করিল।

ডেরা ইসমাইল খাঁতেও দাঙ্গা বাধিল। সেখানে অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় একহাজার দোকানে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ হইল। দেখিতে দেখিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শহর হইতে গ্রামাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িল। অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিম অধিবাসীদের সকলকে হয় হত্যা নয় ধর্মান্তরিত করা হইল। ডাঃ খান্ সাহেবের সরকার কঠোর হস্তে দাঙ্গাদমনের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। মুসলিম লীগপন্থীরা ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করিল। কিন্তু ডাঃ খান্ সাহেব-পরিচালিত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভাঙিতে পারিল না।

পাঞ্জাবে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবকে মুসলিমপ্রধান ও অমুসলিমপ্রধান দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব আনিল। নেহরু গান্ধীজীকে জানাইলেন যে, ইহাই জিন্নার পাকিস্তান দাবীর যোগ্য উত্তর। প্যাটেল জানাইলেন, পাঞ্জাবের অবস্থা বিহারের অপেক্ষাও খারাপ।

১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসিলেন। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তিনি তাঁহার পরিকল্পনা মোটামুটি স্থির করিয়া ফেলিলেন—ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি সম্মত হইলে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা হইবে; প্রদেশগুলিকে মোটামুটি নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হইবে; বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করা হইবে; আসামের শ্রীহট্ট জেলা মুসলিমপ্রধান হওয়ায় তাহা বিভক্ত বঙ্গের পূর্বাংশের সহিত যুক্ত হইবে; এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কোন্ অংশের সহিত যুক্ত হইবে, তাহা নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির হইবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন নিজে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সফরেও গেলেন।

১লা মে কংগ্রেসের নেতাদের অনুরোধক্রমে গান্ধীজী দিল্লীতে

আসিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার কথা তাঁহাকে জানানো হইলে তিনি বলিলেন, "বৃটিশের হাত হইতে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাইবার বিনিময়ে ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিক্রয় করা যায় না। হয় ইংরেজ সরকার ক্ষমতাহস্তান্তরের পূর্বে দৃঢ়হস্তে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনুক, নচেৎ ভারতীয় দলগুলি নিজেদের মধ্যে শেষ মীমাংসায় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুক।" কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর এই পরামর্শ গ্রহণে সমর্থ হইলেন না। কলিকাতা, দিল্লী, লাহোর, কানপুর, অমৃতসর, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ প্রভৃতি স্থান হইতে যে ভয়াবহ সংবাদ ক্রমাগত আসিতেছিল, তাহাতে তাঁহাদের এই ধারণা হইয়াছিল যে, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র দেশ অরাজকতায় পূর্ণ হইবে। ১লা মে সন্ধ্যায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল। গান্ধীজী বৈঠকে উপস্থিত থাকিলেও আলোচনায় যোগ দিলেন না। কংগ্রেস ভারতবিভাগের পক্ষে নমনীয় ভাব দেখাইল।

ঘটনার গতিতে আবদুল গফর খান্ মর্মাহত হইলেন। তিনি এবং খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররা কংগ্রেসের সহিত নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করিয়াছিল। কিন্তু এখন ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে ভারতে আর তাঁহাদের স্থান রহিল না এবং মুসলিম লীগের সহিত তাঁহাদের মতাদর্শের মিল না থাকায় পাকিস্তানেও পরদেশী হইবেন।

৭ই মে আবদুল গফর খান্ বিষণ্ণ চিত্তে মহাত্মা গান্ধীকে কলিকাতায় রওনা করিয়া দেওয়ার জন্য স্টেশনে গেলেন। মাউন্টব্যাটেন পুনরায় আলোচনার জন্য লণ্ডনে গেলেন এবং লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ২রা জুন ভারতবিভাগের পক্ষে প্রস্তাব ভারতীয় নেতাদের জানাইলেন। ৩রা জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ঐ প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হইল। আবদুল গফর খান্ মর্মাহত ও বিমূঢ় অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। তিনি কয়েক মিনিট কথা কহিতে পারিলেন না। পরে বলিলেন, তাঁহারা সর্বদাই কংগ্রেসকে সাহায্য

করিয়াছেন। আজ যদি কংগ্রেস তাঁহাদিগকে ত্যাগ করে, তবে মুসলিম লীগ উপহাস করিবে, এবং সীমান্ত প্রদেশবাসীরাও ভাবিবে, কংগ্রেস তাহাদিগকে নিজের প্রয়োজনমতোই ব্যবহার করিয়াছে। তিনি বলিলেন, কংগ্রেস যদি আজ তাঁহাকে ও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদিগকে নেকড়ের মুখে ফেলিয়া দেয়, তবে তাহা কংগ্রেসের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে।

শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি আবদুল গফরের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতবিভাগ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভোট-গ্রহণের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইল। আবদুল গফর খান্ বিষাদ-ভারাক্রান্তচিত্তে বৈঠক হইতে বাহিরে আসিলেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নেহরু ও জিন্না গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা বেতারে দেশবাসীকে জানাইলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এখন আবদুল গফরকে বুঝাইলেন, আপনারা নির্বাচনে জয়লাভ করিলেই তো ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ রূপে থাকিতেছেন। সুতরাং যাহাতে নির্বাচনে জয়লাভ করা যায়, তিনি সেই চেষ্টা করুন। কিন্তু আবদুল গফর বলিলেন, হিন্দু-ভারতে না মুসলিম-পাকিস্তানে যোগ দিবে, এই প্রশ্ন সাধারণ পাঠানের কাছে তুলিলে তাহারা স্বভাবতঃ মুসলিম-পাকিস্তানেই যোগ দিতে চাহিবে। ভারতবিভাগের বিরুদ্ধে পাঠানরা ভোট দিয়াছিল। ভারতবর্ষ যখন বিভক্তই হইল, তখন পাঠানরা ভারতে যোগ দিবে না। পাকিস্তানে যোগ দিবে কিনা এই প্রশ্নে ভোটগ্রহণ না হইয়া পাঠানরা পাকিস্তানে যোগ দিবে, না পাকতুনিস্থানে যোগ দিবে, এই প্রশ্নে ভোট হউক। কিন্তু বড়লাট, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে শেষ চুক্তি হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ না করিয়া তাহা হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং কেহই এই প্রস্তাবে রাজী হইল না। তাই আবদুল গফর খান্ ও তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারগণ ভোটগ্রহণ বর্জন করিলেন।

৬ই জুলাই সীমান্ত প্রদেশে ভোটগ্রহণ শুরু হইল এবং ১৮ই

জুলাই শেষ হইল। পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ২৮৯২৪৪ এবং ভারতে যোগদানের পক্ষে ২৮৭৪টি ভোট পড়িল। ইহাতে দেখা গেল, মোট ভোটার-সংখ্যার মাত্র অর্ধেক পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। খোদাই খিদ্‌মদ্‌গাররা ভোটবর্জন করায় তাহাদের নামেও পাকিস্তানের পক্ষে বহু জাল ভোট পড়িয়াছিল। পুলিস ও সৈন্যদল আনিয়াও তাহাদের দ্বারা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে জাল ভোট দেওয়া হইয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির নামেও জাল ভোট পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে পড়িয়াছিল।

যাহাই হউক, এই ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট যখন ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্ট হইল, তখন পাকিস্তানের মানচিত্রেই সীমান্ত প্রদেশ স্থান পাইল।

২৭শে জুলাই গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আবদুল গফর দিল্লী আসিয়াছিলেন। দীর্ঘ ২২ বৎসরের মধ্যে আর তিনি ভারতে আসেন নাই।

নেকড়ের মুখে

সত্যই, আবদুল গফর খান্ ও তাঁহার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-বাহিনী নেকড়ের মুখে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইল। সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আনন্দ-উৎসাহ দেখাইল না। এখন আবদুল গফর অনিবার্যকে ধীরে ও শান্তভাবে মানিয়া লইতে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারগণকে পরামর্শ দিলেন। পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন ও শপথ গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান্‌সাহেবকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হইলেও গভর্নর তাঁহাকে ভয় দেখাইলেন যে, মুসলিম

লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত থাকিবে, তাই তিনি নিজ-দায়িত্বে আসিতে পারেন। দুরভিসন্ধির আভাস পাইয়া ডাঃ খান্ সাহেব অনুষ্ঠান বর্জন করিলেন। অতঃপর গভর্নর তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিলেন। ডাঃ খান্ সাহেব স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল এবং গণতন্ত্রের সামান্য রীতিও জলাঞ্জলি দিয়া আবদুল কোয়াইয়ুম খানের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আবদুল গফর খান্ খোদাই খিদ্‌মদ্‌গারদের এক সভায় ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহারা পাকিস্তানের প্রতি নাগরিক রূপে আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন এবং কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছেন। এই সভায় তিনি ডাঃ খান্ সাহেবকে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পদচ্যুত করিবার নিন্দাও করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বৃটিশের সৃষ্টি, ইংরেজরাই তাহার এই নাম দিয়াছিল। তিনি দাবী করিতেছেন যে, এখন হইতে ডুরাণ্ড লাইনের এদিকের পাঠান-অধ্যুষিত সমস্ত অঞ্চল পাকিস্তানের অংশরূপে পুকতুনিস্থান নামে পরিচিত হউক। পুকতুনিস্থানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার থাকিবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভার কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অন্য সকল বিষয়ে পাঠানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থাকিবে। পুকতুনিস্থানের জন্য তিনি সমগ্র জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একাকী হইলেও এই সংগ্রাম তিনি চালাইয়া যাইবেন।

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় এখন আবদুল গফর খান্ পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচীতে গণপরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলেন এবং পাকিস্তানের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। পরদিন পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল জিন্না তাঁহাকে স্বীয় ভবনে

আমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ আমার পাকিস্তানের স্বপ্ন সফল হইয়াছে।" আবদুল গফর ও জিন্নার মধ্যে আলোচনা আন্তরিকভাবে হইল। আবদুল গফর জিন্নাকে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সংস্থার সভাপতি হইতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। জিন্না তাহাতে সম্মত হইলেন। জিন্নার সহিত আবদুল গফরের এই সৌহার্দ্য সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগপন্থীদের মনঃপূত হইল না। তাহারা জিন্নার কান ভারী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরামর্শে জিন্না খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার-সংস্থার সভায় যোগ দিতেও অসম্মত হইলেন। জিন্নার চক্ষে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য আবদুল কোয়াইয়ুম খান্ বেপরোয়া ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জিন্না সীমান্ত প্রদেশে গেলে তাঁহার সভায় আবদুল কোয়াইয়ুম নিজের ভাড়াটে লোক দিয়া গোলমাল করাইলেন এবং জিন্নাকে বুঝাইলেন যে, খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গাররাই এই দুষ্কর্ম করিয়াছে। জিন্নাও তাহাই বুঝিলেন এবং খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সংস্থাকে নিশ্চিহ্ন করিবার নির্দেশ দিয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে আবদুল গফর খান্ সিন্ধু প্রদেশের মিঃ সৈয়দের সাহায্যে পিপল্‌স্ পার্টি গঠন করিয়াছিলেন। তিনি এই পিপল্‌স্ পার্টির স্বেচ্ছাসেবকরূপে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সংস্থাকে সর্বপাকিস্তানী সংস্থায় পরিণত করিতে চাহিলেন। আবদুল গফর খান্ পিপল্‌স্ পার্টির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই নূতন পার্টির প্রতিষ্ঠাকে ভালোচক্ষে দেখিল না। তাহারা এই পার্টিকে 'হিন্দু' ও বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিল। এই পার্টিকে ভারত টাকা যোগাইতেছে, এমন কথাও প্রচার করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পিপল্‌স্ পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবদুল গফর খান্ আবার সীমান্ত প্রদেশের জেলায় জেলায় ঘুরিতে লাগিলেন। সীমান্ত প্রদেশ সরকার আতঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং

আবদুল গফর খান্‌কে গ্রেফতার করিতে মনঃস্থ করিল। ১৯৪৮ সালের ১৫ই জুন আবদুল গফর ও তাঁহার মধ্যম পুত্র ওয়ালি গ্রেফতার হইলেন। বান্নু যাইবার পথের ধারে একটি বাংলোতে আবদুল গফরের বিচার হইল এবং তাহাকে রাজদ্রোহীর অপরাধে তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। আবদুল গফর পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলে প্রেরিত হইলেন।

জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত প্রদেশে সরকারকে বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা দিল। এখন আবদুল কোয়াইয়ুম খিদ্‌মদ্‌গার-নিধনে ব্রতী হইলেন। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের উপর সর্বত্র নির্যাতন উৎপীড়ন চলিল। ১২ই আগস্ট তারিখে যাহা ঘটিল, তাহা কেবল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সহিত তুলনীয়। চারসদ্দার একটি গ্রামে খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের একটি সভা হইয়াছিল। এখানে পুলিস জনতার উপর মেসিন-গান চালাইয়া বহু শত নরনারীকে হত্যা করিল। ডাঃ খান্‌ সাহেব এবং আবদুল গফর খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র গনি গ্রেফতার হইলেন। কোয়াইয়ুম ও তাহার চক্র সীমান্ত প্রদেশে বিভীষিকা সৃষ্টি করিল। তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহু বিশিষ্ট মুসলিম লীগপন্থীকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইল না। আবদুল কোয়াইয়ুমের কার্যকলাপের সংবাদ জিন্নার কানে গেলে তিনি তাঁহাকে ধমক দিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নার মৃত্যু হইলে আবদুল কোয়াইয়ুমের দুঃসাহস আরও বাড়িয়া গেল।

আবদুল গফর খান্‌কে মণ্টগোমারি জেলের একটি নির্জন কক্ষে আটক রাখা হইল। এখানে তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিতে লাগিল। এমন কি, তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কেও গুজব ছড়াইয়া পড়িল। পাকিস্তান সরকার এই গুজব অস্বীকার করিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিল। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে আবদুল গফর খান্‌কে লাহোরে এক্‌স্‌-রে করিবার জন্য লইয়া যাওয়া

হইল। সেখানে তাঁহার প্লুরিসি ধরা পড়িল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছিল এবং তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় তাঁহাকে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তিনি মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দিতে রাজী আছেন কি না। আবদুল গফর খান্ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারাগারে আবদুল গফর তিন বৎসর কাটাইয়া যখন বাহিরে আসিলেন, তখনও মুক্তি পাইলেন না। তাঁহাকে ১৮১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুসারে আটক রাখা হইল। ছ' মাস পর পর এই আইনে আটকের মেয়াদ শেষ হইলে আবার নূতন করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইল।

এইভাবে চার বছর কারাগারে থাকিয়া আবদুল গফরের শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার দেহে বড় রকমের অস্ত্রোপচার করিতে হইল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও আফগানিস্থানের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার আরোগ্যকামনা করিয়া শুভেচ্ছা জানাইলেন। মক্কায় হাজার হাজার তীর্থযাত্রী তাঁহার আরোগ্য ও মুক্তিকামনা করিয়া উপাসনা করিলেন।

১৯৫৩ সালে তাঁহাকে জানানো হইল যে, পাকিস্তান সরকার আর দীর্ঘ দিন তাঁহাকে আটক রাখিতে চাহে না, তাঁহাকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হইবে। ১৯৫৪ সালের ৫ই জানুয়ারি পাকিস্তান রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইল যে, আবদুল গফর খান্‌কে মুক্তি দেওয়া হইতেছে, তবে তাঁহাকে পাঞ্জাবে থাকিতে হইবে, সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

রাওলপিণ্ডি জেল হইতে আবদুল গফর খানকে যখন মুক্তি দেওয়া হইল, তখন জেলের সম্মুখে সমবেত অগণিত মানুষ "বাদশা খান্ জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত করিল।

কিন্তু আবদুল গফর রাওলপিণ্ডি জেলের বাহিরে আসিলেও তিনি প্রকৃত মুক্তি পাইলেন না। তাঁহাকে সারকিট-হাউসে অন্তরীণ

করিয়া রাখা হইল। তাঁহাকে কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিতে বা কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইল না। তিনি বলিলেন, ইহার অপেক্ষা রাওলপিণ্ডি জেলই তাঁহার ভালো ছিল।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে করাচীতে পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে দিল। আবদুল গফর নিয়মিতভাবে গণ-পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে মৌলবী ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ইহার সহিত সীমান্ত প্রদেশে ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করিবার তুলনা করিলেন।

ভারতে ১৯৫০ সালেই নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তানে তেমন কিছু হয় নাই এবং সংবিধান রচনার কাজ শম্বুকগতিতে চলিতেছিল। সংবিধান রচনার বিষয়ে মুসলিম লীগ পার্টির মধ্যেও ঐকমত্য ছিল না। লিয়াকত আলি খান্ পাকিস্তানের সংবিধান সম্পর্কে যে মূলনীতির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল, পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হইবে ; উহার গঠন হইবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ; উহাতে পাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিটি মুসলমানকে সমান অধিকার দানের প্রস্তাব ছিল। পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই গণতান্ত্রিক নীতিগুলি অবশ্যই সংকীর্ণ ও অনুদার ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলি খান্ আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এখন গণ-পরিষদে যখন রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিল, তখন বর্তমান সংবিধানের রচয়িতারা দ্বিমত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইলে পূর্ববঙ্গেই সমস্ত পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে বেশী লোক বাস

করায় কেন্দ্রীয় আইনসভায় তথা শাসনব্যবস্থায় বাঙ্গালীর প্রাধান্য ঘটিবে। ইহা পাঞ্জাবের জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর মনঃপূত হইল না। পাঞ্জাবের ধনিক ও জমিদার শ্রেণী বাংলা, সিন্ধু, বালুচিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশকে তাহাদের উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার ফলেও বাঙ্গালী মুসলমানেরা বিরোধিতা করিতে লাগিল। কারণ, উর্দু পাকিস্তানের শতকরা চার জন লোকের মাতৃভাষা, অন্যপক্ষে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অর্ধেকেরও বেশি লোকের মাতৃভাষা। ভাষার প্রশ্নেও তাই তীব্র মতবিরোধ দেখা দিল।

১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণ-পরিষদ পূর্ব বাংলা ও সিন্ধুর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানকে ছয়টি প্রদেশে ভাগ করিবার প্রস্তাব করিল। এই ছয়টি প্রদেশ হইল—পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বাহাওলপুর, খৈরাপুর ও বালুচিস্থান। কিন্তু পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ নেতারা এই প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করিল। মিঞা মহম্মদ মমতাজ খান্ দৌলতানা, মুস্তাক আহম্মদ গুরমানি প্রভৃতি পাঞ্জাবী নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি ইউনিট করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলিও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক-ইউনিটে পরিণত করিবার জন্য অভিযান চালাইলেন। তাঁহারা সীমান্ত প্রদেশের ডাঃ খান্ সাহেবের মতো জনপ্রিয় নেতাদেরও হাত করিলেন এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করিতে চাহিলেন। খান্ আবদুল গফর খান্ ও পূর্ব পাকিস্তানের নেতা মওলানা ভাসানি এক-ইউনিট প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলেন। ফলে দুই পক্ষে প্রবল সংগ্রাম দেখা দিল।

১৯৫৪ সালের ২৪শে অক্টোবর গভর্নর-জেনারেল সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলেন এবং মহম্মদ আলির নেতৃত্বে আটজন মন্ত্রী লইয়া একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। ইহাতে

পাঠান আয়ুব খান্‌কে প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ও ডাঃ খান্‌ সাহেবকে অন্যতম মন্ত্রী করা হইল।

২২শে নভেম্বরগণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলি পশ্চিম পাকিস্তানকে এক-ইউনিট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ডিসেম্বর মাসে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একজন গভর্নর ও একটি আইনসভা চালু করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে মুস্তাক আহ্‌ম্মদ গুরমানি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর ও ডাঃ খান্‌ সাহেব সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন।

আবদুল গফর খান্‌ ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে রাওলপিণ্ডি হইতে একটি বিবৃতি দিলেন। তিনি এক বৎসরকাল মুক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহাকে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। সরকার যদি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে জেলে আটক রাখাই ভালো। সরকার কেন তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাহার মূল কারণ হইল তাঁহার গণতন্ত্রে অবিচল বিশ্বাস। তিনি আগেও বলিয়াছেন এবং এখনও বলিতেছেন, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান এক-ইউনিট হইবে কিনা নির্বাচনের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে জনমত লওয়া উচিত। তাঁহার ও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার সংস্থার প্রতি সরকারের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয় নাই। খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার-সংস্থা এখনও নিষিদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার 'পাখতুন' পত্রিকারও একই দশা। তিনি যেখানেই যান, পুলিস তাঁহার পেছনে যায়। পাঞ্জাবের বাহিরে যাইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। এমন কি পাঞ্জাবের দুঃস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় তাঁহাকে আত্মনিয়োগ করিতে দেওয়া হইতেছে না।

তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয় যে, সীমান্ত প্রদেশে আইনসভা যে পশ্চিম পাকিস্তানের এক-ইউনিট ব্যবস্থার পক্ষে ভোট দিয়াছে,

সে সম্পর্কে তাঁহার অভিমত কি? তিনি বলিলেন, তাঁহাকে সীমান্ত প্রদেশে যাইতে দিলে তিনি দুনিয়াকে দেখাইতে পারিতেন, এই সমর্থনের প্রকৃত মূল্য কি।

সপ্তাহকাল পরে তিনি ঘোষণা করিলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানকে এক-ইউনিটে পরিণত করার বিষয়ে জনসাধারণের মনে অপপ্রচারের দ্বারা ক্রমাগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হইতেছে। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছি, ভাষা ও সংস্কৃতির পৃথক অস্তিত্ব ও বিকাশ কখনই পাকিস্তানের দৃঢ়তাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। এই কথা আমি পাকিস্তান উদ্ভবের পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। প্রাদেশিকতা ও প্রাদেশিক বিদ্বেষ দূর করিবার একমাত্র উপায় প্রদেশ-সমূহকে সমান অধিকার দান এবং কেবল তাহার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবেও তাহাই বলা হইয়াছিল। আমি সর্বদাই বলিয়াছি, জনসাধারণই সমস্ত বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত লইতে পারে। তাহারা যদি এক-ইউনিট চায়, তবে তাহাদের উপর কেহই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাপাইয়া দিতে পারে না। বলা হইতেছে, জনসাধারণ এক ইউনিট চায়। তবে তাহাদের অভিমত লইতে বাধা কি?"

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ সম্পর্কে খান্ আবদুল গফর খানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হইল। এই সংবাদ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের বহু স্থানে সমবেত জনতা উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল।

খান্ আবদুল গফর খান্‌কে আওয়ামী লীগ নেতা মাংকি শরিফের পীরসাহেব মোটরকারের বিরাট এক শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গেলেন। পথিপার্শ্বে অগণিত মানুষ 'বাদশা খান্ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিল। ১৭ই জুলাই খান্ আবদুল গফর খান্ বিশাল এক জনসভায় ভাষণ দিলেন। ১৯৪৮ সালে গ্রেফতার

হইবার পর সাত বৎসর পরে এই তাঁহার প্রথম জনসভা। তারপর নওশেরা, পাব্বি, পেশোয়ার প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি বক্তৃতা দিলেন। সর্বত্রই তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা করা হইল।

তিনি এখনও পুকতুনিস্থানের দাবীতে অবিচল আছেন কিনা প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি যে পুকতুনিস্থান দাবী করিতেছেন এবং আফগানিস্থান যে পুকতুনিস্থান দাবী করিতেছে, তাহা এক কিনা প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, আফগানিস্থান কি দাবী করিয়াছে, তাহা তিনি জানেন না ; তবে তিনি যে দাবী করিয়াছেন, তাহা হইল পাকিস্তানের অংশরূপে পাঠানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ।

পেশোয়ার হইতে আবতুল গফর খান্ সরদরিয়াবে তাঁহার সহকর্মীদের সহিত মিলিত হইতে গেলেন। তাঁহার দাদা ডাঃ খান্ সাহেব সেখানে তাঁহাকে এক-ইউনিটের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ঘোষণা করিলেন যে, সরকার আবতুল গফর খানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া তাঁহার দেশপ্রেম পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তিনি এক-ইউনিটের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া পাকিস্তানের দৃঢ়তাকে বিঘ্নিত করিতেছেন। তাই সরকার খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলনকে কখনও পুনর্জীবন লাভ করিতে দিতে পারে না।

আবতুল গফর খান্ এক-ইউনিট প্রশ্নে নির্বাচনের সম্মুখীন হইবার জন্য পাকিস্তান সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাইলেন। তিনি ইস্কান্দার মির্জার অভিযোগসমূহ অস্বীকার করিলেন। ২৯শে জুলাই মাংকি শরিফে সীমান্ত আওয়ামী লীগ ও খোদাই-খিদ্‌মদ্‌গারদের এক মিলিত জনসভায় আবতুল গফর খান্ ও মাকিং শরিফের পীর-সাহেবকে এক-ইউনিট প্রবর্তনের প্রতিবাদে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ভার দিল। আবতুল গফর এক-ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচারের

জন্য সীমান্ত প্রদেশে সফর করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই বিপুল জনসমর্থন পাইলেন। সরদরিয়াবে তাঁহার সদর কর্মকেন্দ্রকে পুনর্নির্মাণের জন্য মহিলারাও অলঙ্কার দিয়া সাহায্য করিলেন। বিশ সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক এক-ইউনিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে কারাবরণের জন্য সংকল্প ঘোষণা করিল। পেশোয়ার অভ্যর্থনা কমিটি আবদুল গফর খান্‌কে যথাসম্ভব সত্বর পেশোয়ারে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইল এবং তিনি আসিতে বিলম্ব করিলে পেশোয়ারের আট শত গ্রামের সমস্ত অধিবাসী তাঁহাকে সম্মান জানাইবার জন্য সরদরিয়াবে উপস্থিত হইবে বলিল।

১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহার সীমান্ত সফর শেষ হইলে তিনি বালুচিস্থানে এক-ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচারে যাইবেন ঘোষণা করিলেন। বালুচ গান্ধী নামে পরিচিত খান্ আবদুস সামাদ খান্ 'পুকতুন ব্রাদারহুড' বা 'পুকতুন সৌভ্রাত্র্য' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণেই আবদুল গফর তাঁহার দুই সঙ্গীসহ বালুচিস্থান যাত্রা করিলেন। সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করিলে তিনি তাহা ভঙ্গ করিলেন। সরকার তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাচের জেলে লইয়া গেল এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর ছাড়িয়া দিল।

আবদুল গফর খান্ এক-ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সিন্ধুতে, পাঞ্জাবে, বাংলাদেশে ও সীমান্ত প্রদেশে প্রচারকার্য চালাইলেন। সরকার এই প্রচারকার্যে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন তাঁহার স্বগ্রাম হইতে ৮ মাইল দূরে শাহীবাগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল যে, তিনি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতেছেন এবং তিনি বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করিতেছেন। কোয়েটায় বালুচ গান্ধী খান্ আবদুস সামাদ খান্‌কেও গ্রেফতার করা হইল।

খান্ আবদুল গফর খান্‌কে পেশোয়ারে আনিয়া হরিপুর জেলে আটক রাখা লইল। তাঁহার গ্রেফতারের পর এক-ইউনিটের বিরোধী নেতাদের অনেকের গৃহে তল্লাস চালানো হইল। ছয় সপ্তাহেরও অধিক কাল আটক রাখিবার পর ৩রা সেপ্টেম্বর লাহোরে পশ্চিম পাকিস্তানের হাইকোর্টে আবদুল গফরের বিচার শুরু হইল। সরকারপক্ষ হইতে অভিযোগ করা হইল, তিনি পাঠানদিগকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন, এমন কি পুকতুনিস্থান লাভের জন্য হিংসার আশ্রয় লওয়াও অন্যায় নয় বলিয়াছেন। ইহাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে এবং পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে পরস্পর বৈরী-ভাব জাগ্রত করা হইয়াছে।

৬ই সেপ্টেম্বর খান্ আবদুল গফর খান্ আদালতে উর্দুতে লিখিত একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন। তাহাতে তিনি সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের বিবরণ ও তাঁহার আদর্শের ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি কি কারণে এক-ইউনিট ব্যবস্থার বিরোধী তাহাও বলিলেন। বিচারের দীর্ঘ প্রহসন হইল এবং ১৯৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি আদালত রায় দিল যে, আবদুল গফর আদালত ছুটি হওয়া পর্যন্ত আটক থাকিবেন এবং তাঁহাকে চৌদ্দ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে। তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকার করিলে তাহা তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া আদায় করা হইবে।

আবদুল গফর খান্ যাহা সত্য, ন্যায় ও অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন, কোনও বাধা বা বিপদ্ তাঁহাকে কোনদিন তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এখনও পারিল না। ১৯৫৭ সালের ২৭শে জানুয়ারি বিরোধী ছয়টি রাজনৈতিক দলের মিলনে পাকিস্থান ন্যাশন্যাল পার্টি গঠিত হইল, আবদুল গফর তাহাতে যোগ দিলেন। তিনি দেশে উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সত্বর সাধারণ নির্বাচন দাবী করিলেন। তিনি বলিলেন, পাকিস্তানকে সুস্থ রাজনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সত্বর রাজনৈতিক

নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন ; কারণ সরকারে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। তিনি বলিলেন, "তোমাদের শাসক-গোষ্ঠী যখন পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি ইউনিটে পরিণত করিয়াছিল, তখন কি তাহারা তোমাদের অভিমত চাহিয়াছিল ! না, চাহে নাই। আমি চাই, সরকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয়ে জনসাধারণের মতামত যাচাই করিয়া দেখুক।"

আবহুল গফর পুনরায় এক-ইউনিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন। পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলি তাঁহার সমর্থনে আগাইয়া আসিল। তিনি সমস্ত পাকিস্তান ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পাকিস্তান ন্যাশন্যাল পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীতে বহু সভা-সমিতি, মিছিল, বিক্ষোভ-প্রদর্শন করিল, এমন কি বহু স্থানে হরতালও করাইল। এক-ইউনিট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, মুসলিম লীগের একাংশ যাহারা ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারা পশ্চিম পাকিস্তানকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া একটি আঞ্চলিক যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব পশ্চিম পাকিস্তান আইনসভায় পাসও হইল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হইল। এক-ইউনিট ব্যবস্থার ঘোর সমর্থক পাঞ্জাবী নেতা গুরমানি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ডাঃ খান্ সাহেবের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হইল।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আবহুল গফর, মওলানা জি. এম. ভাসানি, সৈয়দ প্রভৃতি জাতীয় আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফলে অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সুরাবর্দী সরকারের পতন ঘটিল। এখন রিপাবলিকান পার্টি ও মুসলিম দলের মধ্যে একটি আপোসের ফলে পাকিস্তানে চুন্দ্রিগরের নেতৃত্বে একটি

মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। এই মন্ত্রিসভাও এক মাসের বেশি টিকিল না। তখন স্যার ফিরোজ শাহ্ নুন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। ১৯৫৮ সালের মে মাসে রিপাবলিকান পার্টির নেতা ডাঃ খান্ সাহেব আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। ফিরোজ খান্ নুনের মন্ত্রিসভাও এক বৎসরের বেশি স্থায়ী হইল না। পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে উঠিল।

আবদুল গফর খান্ এক-ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার কার্য চালাইতে লাগাইলেন এবং এক-ইউনিট ব্যবস্থা যে পাঞ্জাবী ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেই করা হইয়াছে, তাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তিনি বালুচিস্থানে প্রচার-ভ্রমণে গেলে কোয়েটার ম্যাজিস্ট্রেট বালুচিস্থানে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর আদেশ জারী করিল। আবদুল গফর খান্ এই আদেশ অমান্য করিলে ১৯৫৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। তারপর তাঁহাকে পেশোয়ারে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ১১ই অক্টোবর আবদুল গফর, মওলানা ভাসানি ও পূর্ব পাকিস্তানের আরও বিশিষ্ট আটজন নেতা গ্রেপ্তার হইলেন। বালুচ গান্ধী আবদুস সামাদ খান্‌কেও গ্রেপ্তার করা হইল। তিনি চৌদ্দ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

এই সকল গ্রেপ্তার ঘটিবার সপ্তাহ কালের মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল আয়ুব খান্ পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাইলেন। সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী হইল। ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর আয়ুব খান্ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ লইলেন। কিন্তু শপথগ্রহণের দুই ঘণ্টা বাদেই তিনি ইস্কান্দার মির্জাকে প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। আয়ুব খান্ নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, এখন হইতে পাকিস্তানে

প্রধান-মন্ত্রীর পদ থাকিবে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রেসিডেন্টের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। আয়ুব খান্ নিজেকে ফিল্ড-মার্শাল উপাধিতে ভূষিত করিলেন। পাকিস্তানে এখন হইতে আয়ুব খানের সামরিক একনায়কত্ব চলিল।

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইল যে, তাঁহার বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া সরকার আবদুল গফরকে মুক্তি দিতেছে; সরকার আশা করিতেছে যে, আবদুল গফর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোনও কাজ আর করিবেন না।

আবদুল গফর খান্ তাঁহার স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। সরকার তাঁহার উপর রাজনৈতিক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য আদেশ দিল। কিন্তু সত্তর বৎসরের এই বৃদ্ধ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তিনি সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করিয়া তাঁহার আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ডেরা ইসমাইল খাঁয় তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইল। অভিযোগ, তিনি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যে লিপ্ত আছেন। কিছুদিন তাঁহাকে পানিয়ালা জেলে আটক রাখা হইল। পরে তাঁহাকে সিন্ধুর হায়দরাবাদ জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। মাসের পর মাস এই বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য বীর সৈনিক পাকিস্তানের কারাগারে অবরুদ্ধ রহিলেন।

তাঁহার স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অবনতি ঘটায় এবং জীবন-সংশয় দেখা দেওয়ায় ১৯৬৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি তাঁহাকে পাকিস্তান সরকার কারাগার হইতে মুক্তি দিল, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার স্বগ্রামে স্বগৃহে অন্তরীণ করিয়া রাখিল।

শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ইংলণ্ড যাইতে অনুমতি দিল। আবদুল গফর খান্ ইংলণ্ডে দু'মাস চিকিৎসাধীনে থাকিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

তিনি আমেরিকা যাইতে চাহিলে পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে, তিনি মধ্য প্রাচ্যে কোথাও যাইতে পারেন, তবে আফগানিস্থান বা ভারতে যাওয়া চলিবে না।

কিন্তু আবতুল গফর আফগানিস্থানে যাওয়াই স্থির করিলেন। আফগান সরকার তাঁহাকে সানন্দে গ্রহণ করিল। তিনি ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কাবুলে পৌঁছিলে এক বিশাল জনতা তাঁহাকে 'ফকির-ই-আফগান জিন্দাবাদ' ধ্বনি সহকারে সংবর্ধনা জানাইল। আফগানিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরাও তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন।

এখন হইতে আফগানিস্থানই এই আফগান বীরের গৃহ হইয়াছে। তিনি এখন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁহার চক্ষে আজও পুকতুনিস্থানের সেই স্বপ্ন ম্লান হয় নাই। আজও তিনি আশা করেন, পাকিস্তান পাঠানদের ন্যায্য দাবীকে মানিয়া লইবে, তাহারা একদিন-না-একদিন মানিয়া লইতে বাধ্য। কারণ, যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, তাহাকে মানুষ কখনও দমন করিতে পারে না। অন্ততঃ এই বীর সত্যাগ্রহীর তাই ধারণা।

---

*

*   *

সীমান্ত গান্ধী খান্ আবদুল গফর খান্ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম। এই অশীতিপর বৃদ্ধ আজও জীবিত, আজও যৌবনের দৃপ্ত শক্তিতে বলীয়ান, আজও অবিরাম সংগ্রামে অবিচলিত; সর্বোপরি, যে স্বদেশের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন আকৈশোর, সেই স্বদেশ থেকে বিতাড়িত।

এই মহামানবের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা রচনা করেছেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীসুকুমার রায়, যিনি খান্ আবদুল গফর খান্‌কে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন, সন্নিকটে থেকে জেনেছেন। যিনি গান্ধীজীর নোয়াখালিতে শান্তি সফরের অমর আলেখ্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর তাই একটি বিশেষ মূল্য আছে, তা বলাই বাহুল্য।

*   *

*